দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দুত্ব
—পৃঃ ১৫

ভারতের বিদেশ নীতির বুনিয়াদ এখন দৃঢ়
—পৃঃ ৩৮

৭২ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা।। ৬ জানুয়ারি, ২০২০।। ২০ পৌষ - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com

স্বামীজী এবং আজকের ভারত

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ১৮ সংখ্যা, ২০ পৌষ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

৬ জানুয়ারি - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

ইরফান হাবিব তাঁর 'ঐতিহাসিকতা'র পরিচয় দিলেন
□ বিশ্বামিত্র □ ৬

খোলা চিঠি : ইতিহাস গড়েছে উনিশ □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

ভুসম্পত্তি ও আবাসন ক্ষেত্রে শুধুই কালো মেঘ নয়, রুপালি রেখাও আছে □ দীপক পারেখ □ ৮

স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্ম মহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেছেন □ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত □ ১১

যুব সমাজের প্রতি বিবেকানন্দের আহ্বান
□ স্বামী ত্যাগিবরানন্দ □ ১৩

স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দুত্ব ভাবনা □ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী □ ১৫

শাক দিয়ে মাছ ঢাকার প্রচেষ্টা সফল হবে না
□ মণীন্দ্রনাথ সাহা □ ১৭

নাগরিকত্ব আইনের সমর্থনে সুশৃঙ্খল জনজোয়ারের সাক্ষী রইল কলকাতা □ অভিমন্যু গুহ □ ২৩

জেলায় জেলায় বিজেপির মিছিলে মানুষের ঢল
□ আদিনাথ ব্রহ্ম □ ২৬

স্মরণে □ ২৮

ভারতমাতার কৃতীসন্তান অটলবিহারী বাজপেয়ী
□ আরতি নন্দী □ ২৯

'রাহ কৌন সী যাউঁ ম্যায়' □ প্রবাল চক্রবর্তী □ ৩০

স্বস্তিক চিহ্নের তাৎপর্য বহুদূর পরিব্যাপ্ত
□ ড. সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৩১

মা মুক্তেশ্বরী কালী □ ড. মনোরঞ্জন দাস □ ৩২

ভারতীয় চিত্রশিল্পের জীবন্ত ঐতিহ্য রাজা রবি বর্মা
□ কৌশিক রায় □ ৩৩

বজ্রাদপি কঠোরানি হওয়ার কথা বলা আছে ভারতীয় দর্শনে
□ কে এন মণ্ডল □ ৩৫

ভারতের বিদেশনীতির বুনিয়াদ এখন দৃঢ়
□ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ □ ৩৮

আমরা কি স্বামীজীকে সত্যিকারে গ্রহণ করেছি?
□ প্রীতীশ তালুকদার □ ৪৩

মানবপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ □ শৈলজা প্রসন্ন ভট্টাচার্য □ ৪৫

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মহামহোপাধ্যায় ড. সীতানাথ গোস্বামী
□ ড. প্রজ্ঞারঞ্জন দত্ত □ ৪৬

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ □ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** □ **অঙ্গনা : ২১** □

সুস্বাস্থ্য: ২২ □ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** □ **চিত্রকথা : ৪২** □

সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৯ □ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

প্রকাশিত হবে ১৩ জানুয়ারি ২০২০

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৩ জানুয়ারি ২০২০

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

উদ্বাস্তু বাঙ্গালির নাগরিকত্ব

ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল কয়েক কোটি উদ্বাস্তুর বোঝা ঘাড়ে নিয়ে। অথচ স্বাধীনতার আগে অথবা অব্যবহিত পরে নাগরিকত্ব সংক্রান্ত যে কয়টি আইন প্রচলিত ছিল তার কোথাও উদ্বাস্তু শব্দটি ছিল না। স্বাধীনতার ৭২ বছর পর মোদী সরকার সেই ঐতিহাসিক ভুল সংশোধন করেছে। কিন্তু নতুন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সর্বসমক্ষে আসার পরেই দেশজুড়ে শুরু হয়েছে বিরোধীদের হিংসাত্মক আন্দোলন। পশ্চিমবঙ্গে এই আইনের পক্ষে যারা তাদের একটা বড়ো অংশ মতুয়া সমাজভুক্ত নমঃশূদ্র আর উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা। এইসব ছিন্নমূল মানুষের নাগরিকত্বের দাবি অনেকদিনের। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে এদের কথা। তারা কি খুশি? নাকি আরেকবার ছিন্নমূল হবার ভয়ে ভীত? উত্তর খুঁজবে স্বস্তিকা।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata**

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

প্রেরণাপুরুষ বিবেকানন্দ

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর চরকা কাটিবার বাহ্যিক আচারের উৎসাহে বিরক্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, 'বাঙ্গলাদেশের যুবকদের মধ্যে যেসব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেচে, আঙ্গুলকে নয়। ভয় হয় পাছে আচারের সংকীর্ণ অনুশাসন সেই নবোদ্বোধিত তেজকে চাপা দিয়ে ম্লান করে দেয়—কঠিন তপস্যার পথ থেকে যান্ত্রিক আচারের পথে দেশের মনকে ভ্রষ্ট করে।' বিবেকানন্দের মধ্যে এক যৌবনের বাণী পড়িতে পারিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের ইহা উপলব্ধি করিতে দ্বিধা নাই যে, বিবেকানন্দ হইতেছেন সেই ব্যক্তি, যিনি ভারত আত্মাকে সঠিক ভাবে জানিয়াছেন, যিনি এক নতুন ভারত গড়িবার বার্তা লইয়াই আসিয়াছেন। শুধু রবীন্দ্রনাথ নহেন, বিবেকানন্দের এই তেজোদীপ্ত উপস্থিতি অনেকেরই শ্রদ্ধায় কারণ হইয়াছে। অগ্নিযুগের বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ফাঁসির মঞ্চে আত্ম বলিদান করিবার পূর্বে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'স্বামীজীকে ভবিষ্যতে সকলে বুঝিতে পারিবেন। তিনি সাইক্লোনিক হিন্দু। তিনিই আমাদের প্রেরণা।' বাঙ্গলার অগ্নিযুগের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিব, স্বামীজীর বাণীই বাঙ্গলার যুবকদের বিপ্লবমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। স্বামীজীর বাণীই পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করিয়া দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করিবার কাজে তাহাদের উৎসাহিত করিয়াছিল। অগ্নিযুগের বিপ্লবীরাই স্বীকার করিয়াছেন, ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রেরণাপুরুষ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দই। মাত্র ৩৯ বছরের স্বল্পায়ু জীবনে কর্মযোগের যে নিদর্শন স্বামী বিবেকানন্দ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার সমতুল্য কোনো উদাহরণ পৃথিবীতে নাই। পরাধীন ভারতবাসীকে আত্মবলে বলীয়ান হইয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার শিক্ষা তিনিই দিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, বিবেকানন্দ হইতেছেন একমাত্র ভারতীয়, যিনি ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া পাশ্চাত্যে গমন করেন নাই। বরং তিনি পাশ্চাত্যকে কিছু দিতে গিয়াছেন।

স্বামীজী উপলব্ধি করিয়াছিলেন একটি জাতি হিসাবে ভারতবাসীকে যদি সমুন্নত শিরে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত হইতে হয়, তাহা হইলে শুধু ব্রিটিশকে বিতাড়নের মাধ্যমেই তা সম্ভব হইবে না। সেই সঙ্গে জাতির চরিত্র গঠনের উপর সবিশেষ নজর দিতে হইবে। স্বামীজী বলিয়াছিলেন, , জাতি হিসেবে আমরা নিজেদের বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটাইতে নীচ জাতকে তুলিতে হইবে। তাহাদের তুলিবার যে শক্তি তাহাও আমাদের অন্তর হইতে আনিতে হইবে। জাতীয় চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে সনাতন হিন্দুত্বই যে ভারতবাসীর প্রাণশক্তি হইতে পারে—তাহাও নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন স্বামীজী। পরানুকরণতা এবং পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ স্বামীজী কখনো সমর্থন করেন নাই। বরং প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের জ্ঞানের সংমিশ্রণে এক নূতন ভারতের উত্থানের স্বপ্নই তিনি দেখিয়াছিলেন। জাতীয়তাবোধের উন্মেষের ভিতর দিয়াই ভারতবর্ষের প্রকৃত অগ্রগতি সম্ভব—স্বামীজী ইহাই বলিয়া গিয়াছেন। বলিয়াছেন—'যতক্ষণভারতের গৌরবময় অতীতকে জনমনে পুনরুজ্জীবিত করতে না পাচ্ছ ততক্ষণ তোমরা থেমো না। তাই হবে প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা এবং এ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত জাতীয়তাবাদ জেগে উঠবে।' এই বিবেকানন্দ সম্পর্কে প্রকৃত মূল্যায়ন রবীন্দ্রনাথ করিয়া গিয়াছেন। কর্মযোগী সম্পর্কে কবি বলিয়াছেন, 'বিবেকানন্দের এই বাণী সম্পূর্ণ মানুষের উদ্বোধন বলেই কর্মের মধ্য দিয়ে ত্যাগের মধ্য দিয়ে মুক্তির বিচিত্র পথে আমাদের যুবকদের প্রবৃত্ত করেছে।'

সুভাষিতম্

দুর্জনঃ পরিহর্তব্যো বিদ্যয়াঽলঙ্কৃতোঽপি সন্।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ংকরঃ।।

বিদ্যালংকারে মণ্ডিত থাকলেও দুর্জনকে সর্বদা পরিহার করে চলা উচিত। কেননা মণি দ্বারা ভূষিত থাকলেও সাপ কি ভয়ংকর নয়?

ইরফান হাবিব তাঁর ‘ঐতিহাসিকতা’র পরিচয় দিলেন

বিশ্বামিত্র-র কলম

ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের আশিতম অধিবেশন। সহিষ্ণুতার অপূর্ব নিদর্শন ভারতবাসী ও বিশ্ববাসী সেদিন প্রত্যক্ষ করলেন। গত ২৯ ডিসেম্বর এই অধিবেশনের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান এবং সেই মহান ঐতিহাসিক, মার্কস লেলিনের পরেই এদেশ-জাত বামপন্থীদের বোধহয় সবচাইতে পূজ্য ঐতিহাসিক তকমা’ধারী ইরফান হাবিব। মৌলনা আবুল কালাম আজাদের একটি প্রাসঙ্গিক বচন উদ্ধৃত করছিলেন কেরলের রাজ্যপাল। বচনটি শুনবেন? আজাদ বলেছিলেন : ‘দেশভাগের পর আপদ বিদায় হয়েছে।’ তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম করলে যার অর্থ হয় পাকিস্তান জন্ম নেওয়ায় এদেশের সমস্ত সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ওই আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপিত হয়েছে। যদিও এটা যে বাস্তব নয় তা ভারতবাসী মাত্রই জানেন, এদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর সীমাহীন অপরিনামদর্শিতার বৈদেশিক সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসাবেই যে পাকিস্তান আজ ভারতের মাথাব্যথার কারণ, তা-ই নয়; তার চেয়েও সাংঘাতিক বিপদ ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে দেশের শত্রুরা পাকিস্তানের বন্ধুরূপে স্বমহিমায় রয়েছে।

সেদিন এই কথাই বলেছিলেন রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান, কালামকে উদ্ধৃত করে তাঁর মনে হয়েছিল সব আপদ পাকিস্তানে যায়নি, বিষবৃক্ষের বীজ ভারতের ভূমিতেও তার বংশবিস্তার করে চলছে। পাক-বিরোধী এহেন ‘অপবাদ’ শুনে বেজায় চটে যান, সেই মহান ‘মার্কসবাদী ঐতিহাসিক’, রীতিমতো আঙুল উঁচিয়ে উত্তেজিত ভাবে তিনি তেড়ে যান মহামহিম রাজ্যপালের দিকে। বলতে শোনা যায় আরিফের উদ্দেশ্যে, ‘গান্ধী বা আজাদের উদ্ধৃতি কেন চিচ্ছেন? গডসের উদ্ধৃতি দিন।’ আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ও ইরফন হাবিবের প্রাক্তন ছাত্র কে কে মহম্মদ তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন কীভাবে তাঁর এককালের ‘পরম শ্রদ্ধেয়’ মাস্টারমশাইটি নিজের অপছন্দের লোককে ‘হিন্দুত্ববাদী’ বলে দেগে দিয়ে দিয়ে নাকাল করার চেষ্টা করতো।

আসলে এই সামান্য কথার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে, আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। নইলে যে বামৈশ্লামিক শক্তি দেশভাগ করল, আজ তাদের ‘অবদান’কে দেশদ্রোহিতার মাপযন্ত্র (কুনকে) হিসাবে দেখা উচিত ছিল, তা না হয়ে তারা ইতিহাস-শিক্ষা দিচ্ছে, কেবল ‘ইতিহাস’-এর মুখোশ পড়ে মিথ্যা প্রচারের নামান্তর মাত্র। অথচ আজ এমনভাবে তা প্রচার করা হচ্ছে যেন এটাই মূলধারার ইতিহাস। ইতিহাস-চেতনা দিয়েই এর প্রতিবাদী কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, ‘সঙ্গীদের তৈরি ইতিহাস’ বলে দেগে দিয়ে অন্যদিকে নজর ঘোরানোর, সত্যকে আড়াল করার সংগঠিত চেষ্টাও দেখা যাচ্ছে।

ইরফান হাবিবের মতো ঐতিহাসিকরা, ইতিহাস বিষয়টা যাদের কাছে কমিউনিস্ট নামক চূড়ান্ত ভারত-বিরোধী তথা দেশদ্রোহী মতবাদ প্রচারের উপকরণ মাত্র, চিরকাল ‘হিন্দুত্বে’র জুজু দেখিয়ে এসেছেন, কারণ প্রকৃত সত্য উন্মোচিত হলে এদের বহুদিনের সযত্ন লালিত ভারত-বিরোধিতার নগ্ন চেহারাটি দেশবাসী ধরে ফেলবেন। কথায় কথায় বামপন্থীরা হাবিব, কিংবা রোমিলা থাপার বা বিপানচন্দ্রের মতো ঐতিহাসিককে ‘কোট’ (উদ্ধৃত) করে, যার মাধ্যমে ভারতবর্ষ মানেই একটি আদ্যন্ত অপকৃষ্ট দেশের ছবি ভাসিয়ে তোলা মৌলনা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের ভাষায় ‘সব আপদ পাকিস্তানে গেছে’, এমন ধারণা সঠিক নয়, আরিফ সাহেব যা বলেছেন— ‘বিষবৃক্ষ এদেশের মাটিতেও রোপণ হচ্ছে’ এই ধারণাই ঠিক। ‘বামপন্থী ঐতিহাসিকতা’ নামক বিষবৃক্ষের উচ্ছেদের দায় আমাদেরই।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট পরিবর্তিত হয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে। তাই

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name	:	**OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No.	:	**917020084983100**
IFSC Code	:	**UTIB0000005**
Bank Name	:	**AXIS Bank Ltd.**
Branch	:	**Shakespeare Sarani, Kolkata**

ইতিহাস গড়েছে উনিশ

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। ২০২০ সালের প্রথম চিঠিতে সকলের জন্য রইল শুভকামনা। এই চিঠি যখন লিখছি তখন এই দশকের শেষ সূর্যাস্ত চলছে। পুরনো বছরটাকে বিদায় জানানোর আগে মনে পড়ছে ফেলে আসা বছরের অনেক কিছু। যা সত্যিই এই ভারত দেখল। একটা বছরে এমন ইতিহাস তৈরি অতীতে হয়নি। আসুন আপনাদের শুধু মনে করিয়ে দিই কয়েকটা ঘটনার কথা। ২০১৯ বছরটার উল্লেখ বারবার আসবে। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস চিরদিন মনে রাখবে এই ঘটনাবহুল বছরটাকে। আর তার কারণ অনেক।

দ্বিতীয় মোদী সরকার :

এই বছরের মে মাসে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসে বিজেপি। লোকসভা নির্বাচনে অনেকটা শক্তি বাড়িয়ে দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসেন নরেন্দ্র মোদী। ৫৪৩ আসনের লোকসভায় বিজেপি একাই পায় ৩০৩টি আসন। এনডিএ জয় পায় ৩৫৩টি আসনে।

রাহুল গান্ধীর পদত্যাগ :

পর পর বিভিন্ন রাজ্যে হারের মুখ দেখছিল কংগ্রেস। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের ফলে রীতিমতো ভরাডুবি হয় শতাব্দী প্রাচীন দলের। ৫৪৩ আসনের লোকসভায় মাত্র ৫২টি-তে জয় পায়। এর পরেই পরাজয়ের দায় নিজের কাঁধে নিয়ে দলের সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ান রাহুল গান্ধী, পরে আগস্ট মাসে দায়িত্ব নেন সোনিয়া গান্ধী।

৩৭০ ধারার অবলুপ্তি :

জম্মু-কাশ্মীরে সাত দশক ধরে চলা ৩৭০ ধারার অবলুপ্তি হয় এই বছরেরই। ৫ আগস্ট শুধু একই সঙ্গে ওই রাজ্যকে দু'ভাগ করে কেন্দ্র। জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ নামে দুই আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্ম হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা, তাঁর ছেলে ওম আবদুল্লা, পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতিকে গৃহবন্দি করে কেন্দ্র। বন্ধ করে দেওয়া হয় উপত্যকার ইন্টারনেট পরিষেবা।

অসমের নাগরিকপঞ্জী প্রকাশ :

ছ'বছর ধরে চলা এনআরসি-র কাজ এই বছরেই শেষ হয় অসমে। ৩১ আগস্ট প্রকাশিত হয়ে চূড়ান্ত নাগরিকপঞ্জী। সেই তালিকায় তিন কোটির বেশি মানুষের নাম নথিভুক্ত হয়। চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ যায় অসমে বসবাসকারী ১৯ লক্ষ মানুষের নাম।

অযোধ্যা মামলার নিষ্পত্তি :

অযোধ্যায় রাম জন্মভূমি বিতর্কের সমাধান হয় সুপ্রিম কোর্টে। আদালত জানিয়ে দেয় বিতর্কিত জমিতে তৈরি হবে রামলালার মন্দির। অন্য দিকে পাঁচ একর জমি সরকারকে দিতে হবে মসজিদ বানানোর জন্য। এর পরেও অনেক মামলা হয় সুপ্রিম কোর্টে। কিন্তু ডিসেম্বরে সব আবেদন নাকচ করে দেয় সর্বোচ্চ আদালত।

আঁধার চাঁদে যাত্রা :

চাঁদের অন্ধকার দিক স্পর্শ করে ভারতের চন্দ্রযান। গোটা দেশ উৎসব পালন করে ইসরোর উদ্যোগ নিয়ে। যদিও ৭ সেপ্টেম্বর স্বপ্নভঙ্গ হয়। চন্দ্রযান টু পরিকল্পনা মাফিক চাঁদের মাটি ছুঁতে পারেনি। সফট ল্যান্ডিং না হলেও ইসরো দাবি করে এই অভিযান ৯৫ শতাংশ সফল।

নাগরিকত্ব আইন :

এই বছরে দেশ সব থেকে বেশি উত্তাল হয় নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনীকে ঘিরে। লোকসভা ও রাজ্যসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হওয়ার পরে আইন হয়। পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা অবশেষে স্বস্তি পেলেন। স্বস্তি এনে দিল নরেন্দ্র মোদী সরকার।

এমনই নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে যাওয়া উনিশ সত্যিই অনেক ইতিহাস তৈরি করেছে। প্রকৃতির নিয়ম মেনে প্রতি বছর অনেক কিছু হারায় এই বছরে কিন্তু প্রাপ্তির ঝুলিটাও ছোটো নয়।

—**সুন্দর মৌলিক**

ভূসম্পত্তি ও আবাসন ক্ষেত্রে শুধুই কালো মেঘ নয়, রুপালি রেখাও আছে

অতিথি কলম

দীপক পারেখ

ভারতের অর্থনীতির সাম্প্রতিক দোলাচল নিয়ে একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই বছর বিশ্বের কী উন্নত কী উন্নতিশীল সবরকম দেশেই কিন্তু অর্থনীতি নিয়ে প্রচুর বিক্ষোভ সংঘটিত হয়েছে। এই বিক্ষোভের কারণ সব দেশের ক্ষেত্রে এক এমন নয়। তবে অসন্তোষের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে জনমানসের নেতিবাচক অবস্থান। একটা বিষয়ে সব দেশের মধ্যেই যে মিলটি পাওয়া যায় তা হলো সাধারণ মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ভবিষ্যৎ মানোন্নয়নের সম্পর্কে হতাশ।

বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের মানুষও বিক্ষোভে গলা চড়িয়ে সরকারের বিরুদ্ধে যখন রাস্তায় নামে তখন পরিষ্কার হয়ে যায় দেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ কত শক্তপোক্ত ও সর্বজনগ্রাহ্য। সেই কারণে দেশের নাগরিক অধিকারকে কেউ অগ্রাহ্য করার সাহস দেখায় না, বরঞ্চ সরকার তার মর্যাদা দিতেই তৎপর হয়। ভারতের ওপর সারা বিশ্বের এখন কড়া নজর। তাই এটা নিশ্চিত যে, ক্ষমতায় যারাই থাকুক না কেন স্থিরমস্তিষ্কে তারা সাধারণ নাগরিকদের ক্ষোভ-বিক্ষোভ মেটাতে সচেষ্ট হবে।

২০১৯ সাল ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে নিশ্চিত ভাবেই একটা বিশেষ চ্যালেঞ্জ। বৃদ্ধির শ্লথতা রুখতে নানাবিধ ব্যবস্থা সরকারের তরফে নেওয়া হলেও আরও অনেক বাধা টপকাতে হবে। অবশ্য একটা চরম নিরাশাজনক পরিস্থিতির আবর্তে বসে থেকে নিরাপদ দূরত্বের আরামকেদারা-সমালোচক হওয়া খুব সহজ। এর বিকল্প হিসেবে দেশের শিল্প বাণিজ্য পরিচালকদের সরাসরি সরকারের সঙ্গে আলোচনা, নির্দিষ্ট সংশোধনী প্রস্তাব দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়নে গঠনমূলক ভূমিকা নেওয়া এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিতে পারে। সন্দেহবাদীরা বলতেই পারেন এতে কি সত্যিই কোনো ফল হবে? অবশ্যই, আমাদের হাতে অকাট্য প্রমাণ থাকার কারণে আমরা বলতেই পারি সর্বসাধারণের সাধ্যের মধ্যে আবাসন ক্ষেত্রে (affordable limits) এই মত বিনিময় প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত সুফল পাওয়া গেছে। নিশ্চিত ভাবেই এখানে রুপালি রেখা দেখা যাচ্ছে, যা মনযোগের দাবি রাখে।

নাগরিকরা সম্পত্তির মালিক হতে পারবে এমন একটি গণতন্ত্র গড়ে ওঠার বহুবিধ সুফল যে আছে তা বিশ্বে স্বীকৃত। ভারতে যতই মফস্‌সল থেকে শহুরে অঞ্চল বেশি গড়ে উঠছে সাধ্যের মধ্যে আবাসনের প্রয়োজনীয়তা ততই বাড়ছে। শহরবাসীর কর্মক্ষেত্র ও আর্থিক ক্ষমতার নাগালের মধ্যে বাসগৃহ থাকা inclusive city এর প্রধান শর্ত। যে কোনো পরিবারের ক্ষেত্রেই নিজস্ব বাড়ি থাকাটা ক্ষমতায়নের প্রথম ধাপ। এর সঙ্গেই জড়িত উন্নত জীবনযাপন ও সামাজিক নিরাপত্তার প্রসঙ্গটি। বিশ্বের মধ্যে ভারতই একমাত্র দেশ যেখানে বাড়ি কিনলে গৃহঋণ বাবদ একই সঙ্গে মূল ঋণের কিস্তি পরিশোধের টাকা ও সুদ এই দু'য়ের ওপরেই আয়করে ছাড় দেওয়া হয়। এটা সরকারের তরফে নিঃসন্দেহে বড়ো পৃষ্ঠপোষকতা। সকলের জন্য আবাস— এই লক্ষ্যটি সরকারের অগ্রাধিকারে রয়েছে। বলতেই হবে দেশের আবাসন ও নগর উন্নয়নমন্ত্রক এই যোজনায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে কাজ করছে। ২০১৫ সালে শহরে বাস করা নির্ধারিত সীমার অধীন মানুষদের 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার 'মধ্যে আনা হয় যাতে তারা পাকা বাড়ির মালিক হতে পারেন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৯ সালের ডিসেম্বর অবধি এই যোজনায় ১.০৩ কোটি বাড়ি তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৬০ লক্ষ বাড়ি তৈরি শুরু হয়েছে, আর ৩২ লক্ষ বাড়ি তৈরি হয়ে গেছে। এটা সরকারের একটা বলার মতো সাফল্য সন্দেহ নেই।

> "ভারতের অর্থনীতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিল্পপতি ও সরকারের পরস্পর মত বিনিময় করে পরিস্থিতি নির্ভর সিদ্ধান্ত নিতে পারলে বৃদ্ধির গতি আসবেই।"

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় চার ধরনের বাসস্থান সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও তার নির্দিষ্ট রূপায়ণের ব্যবস্থা রয়েছে (১) শহুরে বস্তি ঢেলে সাজানো, (২) ঋণের সঙ্গে (গৃহ) সরাসরি সরকারি ভরতুকি পাঠিয়ে দেওয়া, (৩) একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে অংশীদারিতে সাধ্যের মধ্যে আবাসন নির্মাণে ভরতুকি, (৪) নিজের বাড়ি নিজেই তৈরি করা। এই চারটি ক্ষেত্রেই নির্মাণ খরচ কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও কিছু অংশ আবাসন মালিকের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে।

ঋণের সঙ্গে ভরতুকি সংযুক্ত করে দেওয়ার প্রকল্পটি অত্যন্ত সদর্থক ও জনহিতকর। সমাজের দরিদ্রতম স্তর, কম আয়ের মানুষ, একই সঙ্গে নিজ গৃহের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এমন বার্ষিক ৬ লক্ষ থেকে ১৮ লক্ষ টাকা আয়ের মধ্যমবর্গের মানুষের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। এই সিএলএসএস যোজনায় প্রথমবার যারা ঋণের মাধ্যমে বাড়ি বা ফ্ল্যাট কিনতে যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সুদের অংশটি সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতার অ্যাকাউন্টে দিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে ব্যাঙ্ক

যখন মাসিক কিস্তি ঠিক করে, সুদের অংশ আগেই পেয়ে যাওয়ায় কিস্তির পরিমাণ অনেক কমে যায়। বোঝাই যাচ্ছে এই যোজনা সম্ভাব্য গৃহক্রেতাকে শুরুতেই ঋণ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে উৎসাহিত করে। এর ফলে তুলনামূলকভাবে বেশ তরুণ বয়সেই অনেকে নিজের বাড়ির স্বপ্ন পূরণ করতে পারছেন। এই প্রকল্প যে পর্যাপ্ত সাফল্য পেয়েছে তার প্রমাণ তিনশোরও অধিক প্রাথমিক ঋণদান সংস্থা সরাসরি এগিয়ে এসে এই প্রকল্পে যোগ দিয়েছে। উদ্দেশ্য নিজেদের লাভের সঙ্গেই প্রকল্পটিকেও সফল করে তোলা। একটা বিষয় এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ তাহালো যে কোনো ভরতুকি নির্ভর প্রকল্পের সফল রূপায়ণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নজরদারি ও নিরীক্ষণ ব্যবস্থা ঠিক রাখা। অর্থাৎ সঠিক উপভোক্তার কাছেই সরকারের ভরতুকির অংশ পৌঁছচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা। সিএলএসএস যেহেতু একটি যৌথ প্রকল্প তাই অংশীদারদের মধ্যে ন্যাশনাল হাউসিং ব্যাঙ্ক আবাসন মন্ত্রক স্বয়ং ও প্রাথমিক ঋণদানকারী সংস্থা (পিএলআই) রয়েছে।

ইতিমধ্যে এই প্রকল্পে ১.২ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ ৮.২ লক্ষ ঋণ গ্রহীতাদের বাড়ি তৈরির জন্য বিতরিত হয়েছে। এর মধ্যে সরকারের তরফে বিপুল ১৮৫০০ কোটি টাকার ভরতুকি দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত অংশগ্রহণকারী এই প্রকল্পের ভাগীদার তাদের সকলের সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার জন্য আবাসন মন্ত্রণালয় একটি ওয়েব ভিত্তিক সর্বক্ষণ নজরদারি সক্ষম Credit Link Awas Portal খুলেছে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে যে কোনো ঋণগ্রহীতার আবেদনপত্র গ্রহণ করা, পরীক্ষা করা থেকে ভরতুকি প্রদান করা একই সঙ্গে করা হয়। এর মাধ্যমে ঋণদানে পূর্ণ স্বচ্ছতা, ঋণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ খবরাখবর ভরতুকির পরিমাণ ও প্রদানের সঠিক তারিখ ঋণগ্রহীতা সরাসরি জানতে পারেন। এর ফলে সরকারের ওপর আস্থা বাড়ার সঙ্গে তার অভিযোগও কমে যায়। আজকে সিএলএসএস ভরতুকি প্রদানের প্রথা প্রকরণ নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হয়ে উঠেছে যেখানে শুরু থেকেই সরকার সর্বদা ঋণদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত সুবিধে অসুবিধে, প্রকল্পের পরিবর্তন পরিমার্জন সম্পর্কে মতামত পেয়ে চলেছে। সেই অনুযায়ী প্রকল্পটিকে সর্বদা সংস্কারের মাধ্যমে আরও উন্নত করে উপভোক্তা ও ঋণদাতাদের কাছে সহজ ও দ্রুত ফলদায়ী করে তুলেছে।

তবে, সাধ্য অনুযায়ী আবাসনের এই প্রকল্পে বাড়ি করার ক্ষেত্রে জমি সংক্রান্ত অনুমোদন পাওয়ার এখনও কিছু সমস্যা রয়ে গেছে। এক্ষেত্রে এক জানালা সমাধান লাগু করা প্রয়োজন। এতে গৃহনির্মাণে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে বাড়ি তৈরির জন্য সেইসব সরকারি দপ্তরে ঘুরতে হবে না যেখানে বেআইনি অর্থের আদান প্রদান এখনও বিরাজমান। এই ঘোরাঘুরি নিরসন করতে পারলে বাড়ি তৈরির সময় ও খরচ দুটোই কমে যেতে পারে। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে Urban land ceiling Act মহারাষ্ট্রে ২০০৭ সালে বাতিল করা হয়। কিন্তু কী এক অজানা কারণে বৃহত্তর মুম্বাই নিগমের অধীন অঞ্চলগুলিতে গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে নো অব্‌জেকশান সার্টিফিকেট জোগাড় করতে হয় ওই urban land ceiling দপ্তর থেকেই।

সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ধনী-নির্ধন সকলকেই এক পঙ্‌ক্তিতে নিয়ে আসার ক্ষমতা রয়েছে। তাই অন লাইন এক জানালা পদ্ধতির মাধ্যমে জমি সংক্রান্ত ছাড়পত্র প্রদান শুরু করা অত্যন্ত জরুরি। এর ফলে গৃহ নির্মাণ ও আবাসন শিল্পে অভাবনীয় কিছু ঘটে যেতে পারে।

ভারতের অর্থনীতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিল্পপতি ও সরকারের পরস্পর মত বিনিময় করে পরিস্থিতি নির্ভর সিদ্ধান্ত নিতে পারলে বৃদ্ধির গতি আসবেই। আর পরস্পর হাত মিলিয়ে চলার ফেলে যে সাফল্যগুলি ইতিমধ্যেই অর্জিত হয়েছে তা মানুষের কাছে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা দরকার। শুধু কিছুই হলো না বলে বিলাপ করার মধ্যে কোনো সমাধান নেই, অর্থনীতির খারাপ অবস্থা নিয়ে কেবল বুক চাপড়ালে এর থেকে উত্তরণের পথ মিলবে না। ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে অনেক রুপালি রেখা উঁকি দিচ্ছে। এখন প্রয়োজন যৌথ উদ্যোগে যাতে কালো মেঘ কেটে যায় সে কাজে আত্মবিশ্বাস ও সঙ্কল্প নিয়ে সরকার ও শিল্পমহলের নেমে পড়া।

(লেখক হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফাইনান্স করপোরেশনের চেয়ারপার্সন)

আবেদন

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বর্গত প্রচারক বসন্তরাও ভট্টের কর্মজীবন সংবলিত একটি গ্রন্থ বাংলাভাষায় প্রকাশ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। বসন্তদার সান্নিধ্যে যাঁরা কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা তাঁর জীবনের বহু প্রেরণাদায়ী মুহূর্তের সাক্ষী রয়েছেন। সেই সব ঘটনা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলে তা বর্তমান প্রজন্মের কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবকদের প্রেরণাস্বরূপ হবে। সেজন্য এরকম কার্যকর্তা বা স্বয়ংসেবকদের লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। লেখার সঙ্গে নিজের পরিচয়, ঠিকানা ও ফোন নং দিতে হবে। লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি, ২০২০।

—ভবদীয়—

অদ্বৈতচরণ দত্ত
অঃ ভাঃ সহ প্রচারক প্রমুখ
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

বিশ্বনাথ বিশ্বাস
সভাপতি
পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম

লেখা পাঠাতে হবে

সুদীপ তেওয়ারী
কার্যালয় প্রমুখ কেশব ভবন
৮২৪০৯২১৫৪৪

বাসুদেব পাল
কল্যাণ ভবন
৯৬৭৪৫১৪৯৫২
basudebp421@gmail.com

গজানন বাপট
পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম
৯৪৩৩৯৮৮৯৪৫

রম্যরচনা

তিনটি ভোট

সিপিএম প্রার্থী ভোটে দাঁড়িয়ে মাত্র তিনটি ভোট পেয়েছেন। মন-মেজাজ বেজায় খারাপ। বাড়ি ফিরে দেখেন বউ সুটকেশ গুছিয়ে বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন। প্রার্থী তো অবাক। বউ জিজ্ঞেস করলেন— হারলাম তো আমি। তুমি হঠাৎ মেজাজ গরম করে বাপের বাড়ি চললে কেন?

বউ : একদম ন্যাকামি করবে না বলে দিচ্ছি।

প্রার্থী : আমি আবার কী করলাম। কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

বউ : কিছুই বোঝ না? পেয়েছ তো তিনটে ভোট। তার ভিতর একটা ভোট তোমার নিজের। দ্বিতীয়টি আমার। তৃতীয় ভোটটা কে দিল তোমাকে? আমি কিছুই বুঝি না ভেবেছ?

* * *

ছাত্রের অনুবাদ

Translate into English :

রামবাবুর মৃত্যুর পর তাদের একান্নবর্তী পরিবারটি ভেঙে গেল। তার রত্নগর্ভা স্ত্রীও 'হায় কী হলো' বলে পরলোকগমন করলেন।

ছাত্র লিখেছে :

After Rambabu's death their fifty one family broke and his jewel pregnant wife saying 'Alas ! What happened', Went ot another man.

উবাচ

"অনুপ্রবেশকারীদের রাস্তায় নামিয়ে তাণ্ডব চালিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে অশান্ত করে তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী, আর নাগরিক পঞ্জীকরণ ও নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন।"

দিলীপ ঘোষ
রাজ্য বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ

বনগাঁ ও গাইঘাটায় দলীয় সভায়

"নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করতে গিয়ে একজন মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব কর্তব্য ও ভূমিকার কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভুলে যাচ্ছেন।"

নিত্যানন্দ রাই
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা প্রসঙ্গে

"আসানসোলে আমার কোনও কার্যক্রম থাকলে তৃণমূলের চারজন নেতার বাড়ি র‍্যাফ দিয়ে ঘিরে ফেলা হোক। তা হলে দেখবেন আর কোনও অশান্তি থাকবে না।"

বাবুল সুপ্রিয়
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

আসানসোলে বিজেপি কর্মীদের ওপর তৃণমূলের হামলা প্রসঙ্গে

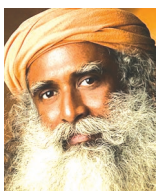

"প্রতিবাদের নামে যারা বাস পোড়াচ্ছে তাদের বোঝা উচিত, বাসগুলো সরকারের নয়, আপনার-আমার টাকায় কেনা। সরকারি সম্পত্তি যারা ধ্বংস করছে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হোক।"

জগ্গি বাসুদেব
যোগগুরু

নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতায় বিধ্বংসী আন্দোলন প্রসঙ্গে

স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্ম মহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেছেন

ড. নির্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিত

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস মহাশয়ের একটা চমকপ্রদ প্রবন্ধ থেকে জানা গিয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত একটা ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থে লেখা হয়েছে চিকাগো ধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ নাকি শুধু মানবমুক্তি, সেবাব্রত, স্বদেশমন্ত্র, ধর্মসমন্বয় ইত্যাদির কথা বলেছিলেন (স্বস্তিকা, ২০.৩.১৮)।

এতে বোঝা যায় রাজনীতি আশ্রিত এই ধরনের লেখকরা স্বামীজী সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। তবে এক্ষেত্রে মনে হয়, অজ্ঞতার চেয়ে মানসিক বিকৃতিই রয়েছে বেশি। 'প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ' সাজার এক উদগ্র কামনাই তাঁদের বিভ্রান্ত করেছে। ছোটদের পাঠ্যপুস্তক লিখতে গিয়ে যদি এই উদ্ভট মানসিকতা তাদের বিভ্রান্ত করে, তাহলে তাঁরা তাদের শেখাবেন কী ?

প্রথমেই বুঝতে হবে স্বামীজীর চিকাগো যাত্রার পটভূমিটা।

দীর্ঘকাল ভারতবর্ষ ঘুরে তিনি দেখেছিলেন দেশের মানুষের নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্যের করুণ ছবি। দেশ তখন দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অবহেলা ও অনাহারে দারুণ ক্লিষ্ট। ধর্মের নামে অনাচার ও কুসংস্কার তখন দেশকে গ্রাস করেছে। পাশ্চাত্যের নাস্তিকতা ও ভোগসর্বস্বতা দেশের সুপ্রাচীন সংস্কৃতিকে আঘাত করেছে। ভারতবাসীর মন থেকে আত্মবিশ্বাস লোপ পেয়েছে। এভাবে এগিয়ে গেলে ভারতের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

তাঁর তখন মনে হয়েছে এই ভারতবর্ষকে জাগিয়ে তুলতে হবে। আত্মবিশ্বাস আনতে হবে, ফিরিয়ে আনতে হবে হারানো আত্মবিশ্বাস ও ধর্মচেতনা, আর সমৃদ্ধ করাতে হবে জীবনধারা ও আর্থিক অবস্থা।

সেই সময় স্বামী তুরিয়ানন্দকে বলেছিলেন, 'হরিভাই.... দেখছি আমার হৃদয়টা খুব বেড়ে গেছে, অপরের জন্য ভাবতে শিখেছি। বিশ্বাস কর, খুব তীব্রভাবে এটা অনুভব করছি।' এই সব কথা বলার সময় তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল।

আর একদিন সমুদ্রতীরে বেড়ানোর সময় তিনি কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন, ' ভগবান! এই দুর্ভাগাদের সৃষ্টি করেছ কেন? এই দৃশ্য যে অসহ্য। কতদিন, প্রভু এই দৃশ্য দেখতে হবে' (স্বামী বিশ্বশ্রয়ানন্দ—স্বামী বিবেকানন্দ, পৃঃ ৪৬)।

তাঁর তখন মনে হয়েছে, ভারতবর্ষকে আবার আর্থিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক দিক থেকে সমৃদ্ধ করতেই হবে। তিনি বলেছেন, দেশের দরকার বিদেশের সমৃদ্ধ দেশগুলোর সঙ্গে সংযোগ, আর্থিক ও বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা। তাছাড়া বিদেশিদের চোখে ভারতবর্ষ তখন এক দরিদ্র, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অন্ধকারময় দেশ। তাই তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে এই দেশের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও ধর্মীয় আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির কথা। বোঝাতে হবে বিদেশি শোষণে ভারতবর্ষ তখন দরিদ্র শোষিত, কিন্তু ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতিতে এটা এক মহান দেশ।

সেই সময়ই আমেরিকার চিকাগোতে ধর্ম-মহাসম্মেলনের দিনক্ষণ ঘোষিত হয়েছে। স্বামীজীর মনে হয়েছিল—এই বিশাল মঞ্চকেই ব্যবহার করতে হবে। পৌঁছতে হবে চিকাগোতে।

স্বামী গম্ভীরানন্দের মতে, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশের জন্য অর্থসংগ্রহ ও বিদেশের সঙ্গে আর্থিক সংযোগ স্থাপন করা (যুগনায়ক বিবেকানন্দ)। অবশ্য শঙ্করী প্রসাদ বসু জানিয়েছেন, স্বামীজী চেয়েছিলেন, বিদেশের বিজ্ঞান সাধনার সঙ্গে ভারতবর্ষকে যুক্ত করতে (স্বামী বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ১ম খণ্ড)। কিন্তু মনে হয় এগুলো ছাড়াও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ও হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য জগতের সামনে তুলে ধরা।

তাঁর মতে ধর্ম যখন অন্যান্য জাতির কল্পনাতেও উদ্ভূত হয়নি তার অন্তত তিনশো বছর আগে আমাদের ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত। .....দর্শনের ক্ষেত্রেও আমরা এখন পর্যন্ত অন্য যেকোনো জাতির চেয়ে অনেক উপরে আছি.... আমাদের সংস্কৃত ভাষা যাবতীয় ইউরোপীয় ভাষার ভিত্তি'--- (সবার স্বামীজী— স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, পৃ: ৩৯)।

এই স্বামীজীকেই আমরা চিকাগোতে দেখেছি। তিনি তখন ভারতের ধর্মীয় দূত। তবে অন্যান্য দেশের ধর্মীয় প্রতিনিধিরা সেখানে গেছেন সসম্মানে। স্বামীজী কিন্তু উপস্থিত হয়েছেন অনাহুত এক সন্ন্যাসী হিসেবে। অনেক কষ্টে তিনি পাঁচ মিনিট বলার অনুমতি পেয়েছিলেন।

অন্যান্য বক্তারা বক্তব্য শুরু করেছেন—'Ladies and gentleman' দিয়ে। কিন্তু স্বামীজী প্রথমেই বলেছেন, 'Brothers and sisters of America।' মুহূর্তেই আপ্লুত হয়েছেন শ্রোতারা, তুমুল করতালিতে আকাশ যেন বিদীর্ণ হয়েছে, সেটা যেন চলছিল কয়েক মিনিট। গেরুয়া বেশধারী সুদর্শন এই তরুণ সন্ন্যাসীকে উঠতে দেখেই শ্রোতারা মুগ্ধ হয়েছিলেন। এবার সেই মুগ্ধতা এনে দিয়েছে বিস্ময়।

পূর্বোক্ত পাঠ্যপুস্তকের লেখক সম্পাদককে জানাই স্বামীজী নিজেকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি বলেই দাবি করেছেন। শুরুতেই তিনি বলেছেন সর্বধর্মের প্রসূতি স্বরূপ যে সনাতন হিন্দুধর্ম, তারই প্রতিনিধি হয়ে আমি আজ আপনাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি—পৃথিবীর যাবতীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের হয়ে আমি আজ এখানে এসেছি (সত্যরঞ্জন চক্রবর্তী—'বিশ্বকে ধর্মীয় নবচেতনা দিলেন স্বামীজী', একদিন, ১১.১১.১৮)। তারপর ধাপে ধাপে তিনি হিন্দুধর্মের মহিমা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করে সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন।

তিনি আরও বলেছেন, আমি সেই ধর্মের অন্তর্গত বলে গৌরব বোধ করি যে ধর্ম জগৎকে শিখিয়েছে পরমত সহিষ্ণুতা ও সর্বজনীন গ্রহিষ্ণুতার আদর্শ, সেই ধর্ম আক্রমণকারীকেও আপন করে নিয়েছে—তারাও ক্রমে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গেছেন। তিনি আরও বলেছেন, আমরা শুধু সব ধর্মকে সত্য বলি না আমরা বিশ্বাস করি সব ধর্মের গোড়ার কথা এক ও অভিন্ন। আমরা সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে গর্ব করি যে ধর্ম পৃথিবীর সব ধর্ম ও জাতির নিপীড়িত ও শরণার্থীদের চিরদিন আশ্রয় দিয়েছে। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, ইহুদিদের একটা অংশকে আমরা দক্ষিণ ভারতে আশ্রয় দিয়েছিলাম, জরাথুস্টের অনুগামীদের এই হিন্দুধর্মই আদরে গ্রহণ করেছিল। এই প্রসঙ্গেই তিনি গীতার সেই কথা উল্লেখ করেছেন 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'(৪।১১)। সুতরাং হিন্দুধর্ম নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করে না, তার শিক্ষা হলো---যিনি ঈশ্বরকে যেভাবে ভজনা করেন, তিনি সেভাবেই তাঁর কৃপালাভ করেন।

তাঁর একটা ভাষণেই বিস্মিত চমৎকৃত হয়েছেন শ্রোতারা। আবেগাপ্লুত হয়েছেন সমস্ত আমেরিকাবাসী। পরাধীন ভারতের এই তরুণ সন্ন্যাসী এভাবে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছেন প্রাচীন এই দেশের বিজয়-বৈজয়ন্তী। স্বামীজী এভাবে শুধু চিকাগো জয় করেননি সেই সঙ্গে ম্রিয়মান আত্মবিশ্বাসহারা ভারতবাসীর প্রাণে সঞ্চারিত করেছেন প্রাণ, চেতনা ও গর্ববোধ (প্রণবেশ চক্রবর্তী—শিকাগো ধর্মসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ, পৃ: ৩১—৩২)।

তাঁর ভাষণ সবাইকে এত মুগ্ধ করেছিল যে যখনই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হতো স্বামীজী ভাষণ দেবেন, তখনই আসন সংগ্রহের জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। বিভিন্ন রাস্তায় তাঁর ফোটো ঝোলানো থাকত, তার সঙ্গে বিজ্ঞাপন থাকত তিনি কোথায় কী বলবেন। সেই জন্য বলা যায় 'চিকাগো সভায় তাঁর আত্মপ্রকাশ ভারতবর্ষের নবজাগরণের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা' (বিবেকানন্দের ভারত প্রত্যাবর্তন, রামকৃষ্ণ মিশন গোলপার্ক, পৃ: ৫)।

এটা লক্ষণীয় যে, তিনি যেখানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হিন্দুধর্মের মহিমার কথা বলেছেন, কিন্তু কখনও এই ধর্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে দাবি করেননি। তিনি সমাপ্তি ভাষণে বরং বলেছেন, বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, ভাবগ্রহণ, বিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তিই কাম্য।

এটাও পূর্বোক্ত আঁতেলদের জানানো দরকার, তিনি একটি লিখিত ভাষণ দিয়েছিলেন বিষয়বস্তু 'হিন্দুধর্ম'। পঞ্চম বক্তৃতার বিষয়ও ছিল হিন্দুধর্ম।

একটা ভাষণে ছিল একটা গল্প। কয়েকজন বক্তা তাদের ভাষণে নিজেদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের কথা ব্যক্ত করেছেন। স্বামীজী সবার শেষে যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন অনেকের মনে হয়েছিল তিনি হিন্দুধর্মের পক্ষে সওয়াল করবেন। কিন্তু তিনি উঠে কুয়োর ব্যাঙের কথা বলেছেন তাদের ধারণা ছিল কুয়োটাই দুনিয়ার সর্ববৃহৎ জলাশয়।

গল্পটা শুনে পূর্ববতী বক্তারা লজ্জায় অধোবদন হয়ে রয়েছিলেন। 'ডেইলী হেরাল্ড' লিখেছেন এই মহান সন্ন্যাসীর দেশে পাদরি পাঠানোর দরকার নেই। 'নর্দাম্পটন ডেইলী' জানিয়েছিল তাঁর ভাষণ শোনার জন্য মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে (১১.৪.১৮৯৪)। আর 'ডেট্রইট জার্নাল' জানিয়েছিল বহু মানুষ চেয়ারের অভাবে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে শুনেছেন তাঁর ভাষণ (২১.২.৯৪)।

বিশ্ব বিজয় করে ফিরে আসার পর স্বাভাবিক কারণেই চমৎকৃত ভারতবাসী তাঁকে রাজকীয় সংবর্ধনা দিয়েছে। কলেজের ছেলেরা ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়া খুলে তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে বক্তৃতা মঞ্চে। শ্রী অরবিন্দ লিখেছেন, স্বামীজী ভারতে এক মহাজাগরণ করে দিয়েছেন তাঁর চিকাগো জয়ের মাধ্যমে। তিনি শুধু প্রাচীন ভারতের মহান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিক সমৃদ্ধির কথা তুলে ধরেননি, মনে করিয়ে দিয়েছেন হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য ও উদারতার কথা।

আমাদের দেশের স্বল্প শিক্ষিত অনেক বুদ্ধিজীবী প্রগতিশীল সেজে সেটা অস্বীকার করতে চান। এটা অজ্ঞতা, সঙ্কীর্ণতা ও রুচি-বিকৃতির এক কদর্য মিশ্রণ। ▮

যুবসমাজের প্রতি বিবেকানন্দের আহ্বান

স্বামী ত্যাগিবরানন্দ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যে সর্বাত্মক জাগরণ হয়েছিল তাঁর প্রক্রিয়াকে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল বিবেকানন্দের বাণী ও আদর্শ। রাশিয়ার অ্যাকাডেমি অব সাইন্সের ডিরেক্টর ই পি চেলিশভ বলেছিলেন— বিবেকানন্দ ছিলেন শান্তি, সমন্বয় এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহান 'প্রফেট'। তিনি ছিলেন অসাধারণ এক দেশপ্রেমিক, এক বরেণ্য গণতন্ত্রপ্রেমী এবং এক মহান মানবতাবাদী। তিনি তাঁর দেশবাসীকে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন। সোভিয়েত দেশের মানুষের চোখে রামমোহন রায় অথবা গান্ধীজীর চেয়ে নতুন ভারত গড়ার স্থপতি হিসেবে বিবেকানন্দের অবদান বেশি বলে স্বীকৃত হয়েছে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা হুয়াং জিন চুয়ান বিবেকানন্দ সম্পর্কে বলেছিলেন— 'চীনদেশে স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা একজন ধর্মীয় নেতামাত্র মনে করি না, আমরা তাঁকে আধুনিক ভারতবর্ষের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারক হিসেবে দেখি।' ভারতবর্ষে তিনিই সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন। ভারতবর্ষের বহু বিপ্লবীর কাছে তিনি ছিলেন প্রেরণার উৎস। বর্তমান চীনে তাঁর দার্শনিক ও সামাজিক চিন্তা এবং বীর্যদীপ্ত দেশপ্রেম কেবল ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকেই উদ্বুদ্ধ করেনি, পৃথিবীর অন্যান্য দেশকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর সম্পর্কে বলেছেন : বিশ্ব-সংস্কৃতির আধুনিক মানচিত্রে বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের মানুষ এই প্রথম হিন্দুধর্মের উচ্চ তত্ত্বগুলিকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। ঐতিহাসিক এ এল ব্যাসম যাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন : আগামী শতাব্দীগুলিতে বিবেকানন্দই বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম প্রমাণ রূপকার হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

সুভাষচন্দ্র তাঁর রংপুর ভাষণে (৩০ মার্চ, ১৯২৯) বললেন, 'সমাজতন্ত্রের জন্ম কার্ল-মার্কসের পুঁথিতে নয়, ভারতীয় সংস্কৃতিতেই তার উৎস ও আশ্রয়। সেই ভাব বিকশিত হয়েছে বিবেকানন্দের বাণীতে।'

দেশকে ভালোবাসা মানেই মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া। তাই, জাতীয়তা বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনকে প্রতিহত করতে গিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়াই স্বামী বিবেকানন্দ নির্দেশিত প্রকৃত পথ।

ইংলন্ড-প্রবাসী অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুকে সেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু (৮ জানুয়ারি, ১৯১৩) লিখেছিলেন : 'আমার মনে হয় আমার দূত আমাদের মধ্যে আসিয়াছেন আমার প্রাণের সকল তমঃ নাশ করিয়া হৃদয়ে অনির্বাণ শিখা জ্বালাইতে। তিনি হলেন ঋষি বিবেকানন্দ।'

জাতির জীবনে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে জাতিকে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি তরুণ প্রাণে জ্বালিয়েছিলেন স্বদেশ প্রেমের অগ্নিদ্যুতি। যুব সমাজের প্রতি তাঁরই কণ্ঠে উদ্‌গিরিত হয়েছিল জ্বালাময়ী বাণী : 'তোমরা কি মানুষকে ভালোবাস? তোমরা কি দেশকে ভালোবাস? তাহলে পিছনে চেয়ো না, অতি প্রিয় আত্মীয়স্বজন কাঁদুক, পিছনে চেয়ো না। সামনে এগিয়ে যাও। ভারতমাতা অন্তত সহস্র যুবক বলি চান।' জাতির উদ্দেশে বলেছিলেন, 'আগামী পঞ্চাশ বছর ধরে গরীয়সী ভারতমাতাই যেন আমাদের একমাত্র আরাধ্যা দেবী হোন। আমরা যেন দাস-মনোবৃত্তি ত্যাগ করে সোনার শিকল ছিঁড়ে ফেলে কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হয়েও সর্বাগ্রে স্বাধীনতা অর্জন করি। কারণ, পরাধীন জাতির কোনো ধর্ম নেই। তোদের একমাত্র কাজ সর্বশক্তি সঞ্চয় করে দেশ থেকে শত্রুকে বিতাড়িত করা।' যুবকদের প্রতি তাই তাঁর আহ্বান : 'তোমাদের জীবন ইন্দ্রিয়সুখের নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়, তোমরা জন্ম থেকেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত। পৃথিবীতে যখন এসেছো তখন অন্তত একটা দাগ রেখে যাও।' এই ভাবেই স্বামীজী স্বদেশের সবুজ প্রাণের কোমল হৃদয়ে জ্বেলেছিলেন অভীঃ মন্ত্রের অগ্নিশিখা।

স্বাধীনতার ৪৮ বছর আগে মিস মেরি হেলকে এক পত্রে (৩০.১০.১৮৯৯) লিখছেন— 'ভারতবর্ষে কয়েক বছর ধরে চলছে ত্রাসের রাজত্ব। ব্রিটিশ সৈন্য আমাদের পুরুষদের খুন করেছে, মেয়েদের মর্যাদা নষ্ট করেছে, বিনিময়ে আমাদেরই পয়সায় জাহাজে চড়ে দেশে ফিরেছে পেনসন ভোগ করতে।' খোদ ইউরোপের মাটিতে দাঁড়িয়ে (১৮৯৫)

তাদের দিকেই আঙুল তুলে তীব্রভাষায় তাদের উদ্দেশে বলেছিলেন : 'ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন, হিন্দুরা রেখে গেছে অপূর্ব সব মন্দির, মুসলমানরা সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ। আর ইংরেজরা? স্তূপীকৃত ভাঙা ব্রান্ডির বোতল, আর কিছু নয়। আমাদের গাঁয়ে গাঁয়ে দেশে দেশে যখন মানুষ দুর্ভিক্ষে মরেছে, তখন ইংরেজরা আমাদের গলায় পা দিয়ে পিষেছে, নিজেদের তৃপ্তির জন্য আমাদের শেষ রক্তবিন্দুটি শুষে নিয়েছে, আর এদেশের কোটি কোটি টাকা নিজের দেশে চালান করেছে। আজ যদি চীনারা জেগে ওঠে ও ইংরেজকে সমুদ্রে ঠেলে ফেলে দেয়, যা তাদের উচিত প্রাপ্য, তাহলে সুবিচার হবে। ইংরেজদের কৃতকর্মের প্রতিশোধ ইতিহাস নেবেই নেবে।' স্বাধীনতার প্রাক্ পর্বে ইংল্যান্ডের মাটিতে দাঁড়িয়ে অত্যাচারী শাসক ইংরেজদের বিরুদ্ধে আর কেউ এইরূপ প্রতিবাদী কণ্ঠে স্বদেশের হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস দেখাননি। এর ফলে ভারতবাসীর মনে বিশ্বাস এসেছিল যে— তাদের মধ্যেও অদম্য শক্তি রয়েছে। পাশ্চাত্যের মানুষও জানতে পারল যে ভারত এক অতি পুরাতন উন্নত কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্পন্ন সভ্য দেশ। ভারতের বাইরে বিবেকানন্দই প্রথম স্বদেশের নিজস্ব মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যা অন্য কোনো বুদ্ধিজীবী বা নেতা একক বা সমষ্টিগতভাবে পারেননি।

সুতরাং পরাধীন ভারতে স্বামী বিবেকানন্দই ছিলেন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রথম সেনাপতি।

যুবসমাজের উদ্দেশে স্বামীজী বলেছিলেন : 'প্রথমে দুষ্ট পুরুতগুলোকে দূর করে দাও। —নিজেদের সংকীর্ণ গত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। প্রভু তোমাদের নড়নচড়নরহিত সভ্যতাকে ভাঙবার জন্য ইংরেজ গভর্নমেন্টকে প্রেরণ করেছেন।' কজন লোকের লক্ষ লক্ষ অনাথের জন্য প্রাণ কাঁদে? হে ভগবান আমরা কি মানুষ! ওই যে পশুবৎ হাড়ি, ডোম তোমার বাড়ির চারিদিকে, তাদের উন্নতির জন্য তোমরা কী করেছ, তাদের মুখে অন্ন দেবার জন্য কি করেছ, বলতে পার? তোমরা তাদের ছোঁও না, 'দূর দূর' কর, আমরা কি মানুষ?' 'ভারতের দরিদ্র, পতিত, পাপীগণের সাহায্যকারী কোনো বন্ধু নেই। সে যতই চেষ্টা করুক, তার উঠবার আর উপায় নেই। তারা দিন দিন ডুবে যাচ্ছে। রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাদের উপর ক্রমাগত আঘাত করছে, কিন্তু তারা জানে না, কোথা থেকে ওই আঘাত আসছে। তারাও যে মানুষ তা তারা ভুলে গেছে। এর ফল দাসত্ব ও পশুত্ব।"

তাই, বলি এগিয়ে যাও বৎস, এগিয়ে যাও। পাশ্চাত্য সমাজ চিরকাল স্বাধীনতা সম্ভোগ করে এসেছে। 'উন্নতির প্রধান উপায় স্বাধীনতা।' ১৮৯৭ সালে বেলুড়মঠে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন যে, 'আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ভারত স্বাধীন হবে। কিন্তু যেভাবে সাধারণত দেশ স্বাধীন হয়, সেভাবে নয়।' হেমচন্দ্র ঘোষকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন : India should be freed politically first. 'ভারতমাতার সেবা করতে চাও তো দেশমাতৃকার দুর্গতি দূর করার জন্য প্রচণ্ড শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করে অগ্রসর হও। জয় তোমাদের অনিবার্য। পরাধীন জাতির কোনো ধর্ম নেই, তোদের একমাত্র ধর্ম মানুষের শক্তিলাভ করে দেশ থেকে শত্রুকে বিতাড়িত করা।' স্বামীজীর মুখে এই বাণী শুনে হেমচন্দ্র সেদিন সংকল্প করেছিলেন যে যতদিন না এই বাণী সার্থক করতে পারছেন ততদিন তাঁর বিরাম নেই। তাই কৈশোর থেকে জীবনে শেষ দিনটি পর্যন্ত বাধার পাহাড়কে তিনি ভয় করেননি, ভয় করেননি দুর্দিনের রক্তচক্ষুকে। কখনো পিছন ফিরে তাকাননি। তিনি বলেছিলেন, 'স্বামীজীর প্রেরণা ও আশীর্বাদ সম্বল করেই আমি বিপ্লবী দল প্রস্তুত করেছি। ভারতমাতা, বন্দে মাতরম্ এবং স্বামী বিবেকানন্দ এই তিনটি সত্যের পতাকা নিয়ে আমরা চলেছি এবং চলেছে বিপ্লবী বিনয়-বাদল-দীনেশ' ('রাখাল বেণু' পত্রিকা, ১৩৮৬, মাঘ-চৈত্র সংখ্যা)। হেমচন্দ্র ঘোষেরই মতোই বিবেকানন্দের পথে চলতে হবে বর্তমান ভারতের যুবসমাজকে, বিশেষত বাঙ্গলার যুবসমাজকে। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের জাতীয়তা বিরোধী আন্দোলন এখন প্রবল। তাই, জাতীয়তা বিরোধী রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাই বিবেকানন্দ নির্দেশিত একমাত্র পথ বলেই লেখকের দৃঢ় অভিমত।

তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কেউই জনশক্তির এই রূপ সদ্ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। ২০ জানুয়ারি, ১৯১২ 'মাইসোর-টাইমস্'-এ প্রকাশিত হয়েছিল : 'বিবেকানন্দ ভারতের সর্বাত্মক জাগরণ এনেছিলেন, বিশেষত তিনি দুঃখী দুর্গত অগণিত সাধারণ মানুষের মুক্তির পথনির্দেশ করেছিলেন। তিনিই ছিলেন শক্তিধর দেশপ্রেমিক। অন্যরা যেখানে একদিকে গদ্‌গদ্ কাকুতি, অন্যদিকে শূন্যগর্ভ আস্ফালন করে যায় দেশপ্রেমিকের ভূমিকা নিয়ে, সেখানে তিনি বুকের রক্ত ঝরিয়েছেন মানবকল্যাণে। তিনিই একমাত্র ভারতের পরিত্রাণকর্তা।' ওই পত্রিকাতেই (৮ মার্চ, ১৯১২) গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে লেখা হয়েছিল : 'পতিত মানুষকে অনুন্নতি থেকে উত্তোলন করাই বিবেকানন্দের ভাবনার প্রধান ভিত্তি এবং কর্মের প্রেরণা দেশবাসীর কাছে সেই পরম মানবতার আদর্শই তিনি দান করে গেছেন।'

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি দুর্ধর্ষ বিপ্লবী কানাইলালের (১০.১১.১৯০৮) ফাঁসি হবে! কারাগারের নির্জন কক্ষে পদচারণা করতে করতে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী থেকে উচ্চকণ্ঠে পাঠ করে শোনাতেন জেলের অন্য বন্দিদের। তাঁকে উচ্চৈস্বরে পড়তে দেখে সাহেব-সুপার ভর্ৎসনা করলে কানাইলাল বলেছিলেন— 'মরতে আমরা ভয় পাই না, সাহেব! মৃত্যুতেই আমাদের আনন্দ। মৃত্যুকে আমরা ভালোবাসি, আর ভালোবাসি আমাদের দেশকে, আমাদের মাতৃভূমিকে। যাঁর লেখা আমি পড়ছি সেই স্বামী বিবেকানন্দই আমাদের মৃত্যুকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন।' তাই, যুবসমাজের প্রতি লেখকের আহ্বান : তোমরা বিবেকানন্দকে ভালোবাসো! কারণ, তাঁকে ভালোবাসা মানেই নিজের দেশকে ও নিজের জাতিকে ভালোবাসা। আর, দেশকে ভালোবাসা মানেই মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া। তাই, জাতীয়তা বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনকে প্রতিহত করতে গিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়াই স্বামী বিবেকানন্দ নির্দেশিত প্রকৃত পথ।

(লেখক রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক, কৈলাসহর, ত্রিপুরা)

স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দুত্ব

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

বিবেকানন্দ বীর, তিনি সন্ন্যাসী; তিনি যোদ্ধা। বীরপূজা যেহেতু মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তি; যুদ্ধ যেহেতু আমাদের সর্বত্রই করতে হবে; তাই আমরা মহাপুরুষদের মধ্যে যোদ্ধৃত্ব রূপ খুঁজি আর সহজেই পেয়ে যাই হিন্দু বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দকে। বিবেকানন্দ মানবজাতির মৌলিক চিন্তা ভাবনার কথা বলেছেন। আগুনের ভাষায় যুবকদের মধ্যে অসীম শক্তি সঞ্চার করেছেন; নতুন উদ্যমে হিন্দু যুবককে উদ্বুদ্ধ করেছেন, আত্ম-চেতনা জাগিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, ''তোমার মধ্যে অসীম শক্তি, তুমিই আনন্দময়।'' তিনি বলেছেন এগিয়ে যাবার কথা, ''Arise, awake and stop not till the goal is reached.'' বলেছেন, শক্তিই জীবন এবং শক্তির শুভ প্রয়োগেই ধর্ম। আমরা তাঁর জীবনীপাঠ করে ধর্মের জন্য শুভঙ্করী শক্তি প্রয়োগ করি। আমরা যোদ্ধা হই, আমরা ভারতবর্ষে বীর-পূজা করি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শক্তির ও ধর্মের শুভ প্রয়োগ ঘটাতে চাই। স্বামীজী সেই বিবেক-শুভ্র বিবেকানন্দ।

স্বামীজী ভারতবর্ষ বলতে কেবল হিন্দুদের ভারতবর্ষই বুঝতেন। মনে করতেন, খ্রিস্টান মিশনারি ও নানান সংস্কার সভার হিন্দুদের প্রতি ঘৃণা ও হিংসার পরিমাণ এত বেশি যে, সে বিষয়ে তাদের কাছে কোনো রকম প্রশ্ন করা সম্পূর্ণ অর্থহীন। প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন— এরা কেন হিন্দুদের সংস্কার-চেষ্টার বিরোধী হবেন? এরা কেন এইসব আন্দোলনের প্রবল শত্রু হয়ে দাঁড়াবেন (আমার সমরনীতি, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র)? বিবেকানন্দের স্বাজাত্য বোধের উৎস ছিল হিন্দুত্ব— ''হিন্দুজাতি সমগ্র জগৎ জয় করিবে।'' তিনি বলেছেন হিন্দুসমাজে যে সমস্ত বিশেষ দোষ রয়েছে, তা বৌদ্ধধর্মজাত; তার উত্তরাধিকার স্বরূপ এই অবনতি। প্রাচীন ভারতে হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণকে তিনি 'বেশ্যাবৃত্তি'-র সঙ্গে তুলনা করে তিরস্কার করেছেন। হিন্দু সমাজত্যাগী মুসলমানদের স্বামীজী 'দেশের শত্রু' বলে চিহ্নিত করেছেন। বলেছেন, 'কোনো লোক হিন্দুসমাজ ত্যাগ করে অন্যধর্ম গ্রহণ করলে সমাজে শুধু যে একটি লোক কম পড়ে তা নয়, একটি করে শত্রু বৃদ্ধি হয়।' তিনি বেদান্ত দর্শনকে মহাসত্য বলে মনে করেছেন। ''বেদান্ত— কেবল বেদান্তই সার্বভৌম ধর্ম হতে পারে, আর কোনো ধর্মই নয়।''

ভারতবর্ষ হিন্দুপ্রধান দেশ। হিন্দুধর্মের এই জল হাওয়া পছন্দ না হলে তিনি তাকে প্রকারান্তরে দেশ ত্যাগ করবার পরামর্শ দিয়েছেন— ''এ দেশে সেই বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন আর কৃষ্ণ বাঁশি বাজাবেন এ দেশে চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড় না কেন।'' ১৮৯৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর শিকাগো ধর্মমহাসভায় খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্য করে বলেন, ''তোমরা খ্রিস্টানরা পৌত্তলিকদের আত্মাকে উদ্ধার করবার জন্য তাদের কাছে ধর্মপ্রচারক পাঠাতে খুবই উৎসাহী; কিন্তু বল দেখি অনাহার ও দুর্ভিক্ষের হাত থেকে দেহগুলো বাঁচাবার জন্য কোনো চেষ্টা কর না কেন? ভারতবর্ষে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের সময় হাজার হাজার মানুষ খিদেয় মৃত্যুমুখে পড়ে, কিন্তু তোমরা খ্রিস্টানরা কিছুই করনি। তারা ভাত চাইছে আর আমরা তাদের পাথরের টুকরো তুলে দিচ্ছি। ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের কথা শোনানো বা দর্শনশাস্ত্র পড়ানো হলো তাকে অপমান করা।'' তিনি পরিষ্কার করেই বলে দিয়েছেন, 'যদি কোনো সম্প্রদায়ের ওঙ্কারোপাসনায় আপত্তি থাকে, তবে তার নিজেকে হিন্দু বলবার অধিকার নেই।' মনে করেছেন, কেবল তখনই কেউ প্রকৃত হিন্দুপদবাচ্য যখন ওই নামটিতে তার ভেতরে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত হয়। যখন যে কোনো দেশীয়, যে কোনো ভাষাভাষী হিন্দু নামধারী হলেই পরমাত্মীয় বোধ হবে; যখন হিন্দুনামধারী যে কোনো ব্যক্তির দুঃখকষ্ট তার হৃদয় স্পর্শ করবে, নিজের সন্তান বিপদে পড়লে যেরকম উদ্বিগ্ন হয় তার কষ্টেও সেরকম উদ্বিগ্ন হবে, তখনই তিনি প্রকৃত হিন্দু হয়ে উঠবেন। তিনি হিন্দুদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ভুলে, চারিদিকে প্রেমের প্রবাহ বিস্তার করতে বলেছেন।

অস্বীকার করার উপায় নেই স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তনীয়া। শিকাগোতে তিনি হিন্দুধর্মের প্রচারের জন্যেই গিয়েছিলেন। তিনি খ্রিস্টান মিশনারিদের সুস্পষ্টভাবে জানিয়েও দেন ভারতবর্ষ কখনই অধ্যাত্মসম্পদে দরিদ্র নয়, দরিদ্র অন্ন-বস্ত্র- বাসস্থানে। মনে রাখতে হবে স্বামীজী অন্য ধর্ম থেকে ভাব নেবার ব্যাপারে খুবই selective ছিলেন। যিশুর সামাজিক সাম্যনীতি তাঁর প্রাণ স্পর্শ করে থাকবে; জগতের কল্যাণের জন্য যে ত্যাগ দরকার হয়, তার রসদও যিশুখ্রিস্টের মধ্যে তিনি পেয়ে থাকবেন।

ঔপনিবেশিক শাসনে থাকবার পর মানুষ স্বভাবতই তাদের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়, নতুবা নানান মত ও পথে তা অতিক্রমণ করতে মনস্থ হয়, কখনও কখনও ঔপনিবেশিক শক্তির মান্য ধর্মকে তীব্রভাবে অস্বীকার করার মানসিকতা জন্মায়। ব্রিটিশ শাসনে থেকে স্বামীজী হয়তো সেই ধর্মীয় পরিমণ্ডল অতিক্রম করার জন্য তাদের ধর্মীয় সেরা দিনটিকেই গ্রহণ করেছিলেন। আর সেই দিনটির মধ্যে হিন্দুধর্মের নবযুগের ইতিহাস রচনা করতে চাইলেন। ১৮৮৬ সালের বড়োদিনের পূর্বসন্ধ্যায় (১৩ পৌষ, ১২৯৩) নয়জন গুরুভাই হুগলীর আঁটপুর গ্রামে বাবুরাম ঘোষের (শ্রীরামকৃষ্ণ পর্ষদ, পরবর্তীকালে স্বামী প্রেমানন্দ) বাড়িতে

উপস্থিত হয়ে ভারতের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক কল্যাণে সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প করলেন। অন্যদিনও তো করতে পারতেন, কারণ আঁটপুরে তাঁর বেশ কয়েকদিন আগেই তিনি পৌঁছেছিলেন। মনে রাখতে হবে, ১৮৮৬ সালেই আগস্ট মাসে ঠাকুরের শরীর যায়। সে বছর ক্রিসমাসের আগের দিন অশ্বত্থ তলায় ধুনি জ্বেলে তাঁরা বসলেন গভীর ধ্যানে, তারপর ঈশ্বর আলোচনা। জানা যায়, স্বামী বিবেকানন্দ যিশুখ্রিস্টের কথা সেদিন বলেছিলেন। এখন প্রশ্ন, এইভাবে দিনটি পালনের পরও পরবর্তীকালে পুরীতে গিয়ে সেই বাবুরাম মহারাজই কেন খ্রিস্টান পাদরিদের ধর্মপ্রচারে জনসমাগমকে বিভ্রান্ত করার জন্য এবং স্বধর্ম চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য 'হরিবোল হরিবোল হরিবোল' ধ্বনি দিয়ে উত্তাল করেছিলেন এবং উপস্থিত মানুষকে তাতে শামিল করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন? আর তাতে সফলও হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা ১৮৯২ সালের ২৫, ২৬, ২৭ ডিসেম্বরের; স্থান কন্যাকুমারী। আবারও ২৫ ডিসেম্বরকে ব্যবহার করলেন স্বামীজী। স্বামীজী অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ডাইনে-বামে-পশ্চাতে ঢেউ আর ঢেউ, অগণিত অনন্য; মহাসাগরের বুকে মিশে যেতে চায় সাগর আর উপসাগর--- অনাদিকাল থেকে তাদের অভিসার যাত্রা। ১৮৯২ সালের ২৫ ডিসেম্বর; আকাশের এক তারা এসেছেন মত্তসাগরের ত্রিকোণ প্রেমের জলধারায় নীলকর দিয়ে। সুনীল জলধি থেকে সন্তানসম ভারতবর্ষের আবির্ভাব; মহাকালের সেই মহান অধ্যায় দেখতে এসেছেন সপ্তর্ষিমণ্ডলের এক আশ্চর্য নক্ষত্র; তার অতীত আর ভবিষ্যৎ মেলাবেন সমাধিতে বসে। পাশেই সমুদ্র-তনয়া কন্যাকুমারী। বড়োদিনই বটে, তার প্রাক্কালে পায়ে হেঁটে কন্যাকুমারী পৌঁছেছেন স্বামী বিবেকানন্দ, তারপর মূল ভূখণ্ড থেকে সাগর-সঙ্গমে ৫০০ মিটার সাঁতরে ভারতীয় পাহাড়ের শেষ বিন্দুতে পৌঁছলেন তিনি; দেখলেন অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন, তারপর অতুল্য কিন্তু অভুক্ত ভারতের জন্য গ্রহণ করলেন এক আধ্যাত্মিক সংকল্প। ধ্যানের শঙ্খনাদে একাদিক্রমে তিনদিন কাটলো— ২৫,২৬, ২৭ ডিসেম্বর।

যে খ্রিস্টাধর্ম মানুষকে 'পাপী' বলে, সেই ধর্মের প্রতিবাদ কেবল স্বামীজীই করেননি, করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণও। মানুষ দেবতা, মানুষ ব্রহ্ম; সে পাপী হবে কীভাবে? সে অমৃতের সন্তান, সে পবিত্র, সে পূর্ণ; পূর্ণতা প্রাপ্তির সব যোগই তার মধ্যে আছে। উপনিষদের ঋষির মতো আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।' হে অমৃতের পুত্রেরা, শোন— আমি এই অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে আলোয় যাওয়ার রাস্তা পেয়েছি। আমি সেই প্রাচীন মহান পুরুষকে জেনেছি, যিনি সকল আঁধারের ওপারে, মৃত্যুকে অতিক্রম করে। এই প্রাচীন বাণী শুনিয়ে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন হিন্দুধর্মে আমাদের পাপী বলতে চাওয়া হয় না। আমরা পবিত্র ঈশ্বরের সন্তান, আমরা মর্ত্যভূমির দেবতা। মানুষকে পাপী বলার মতো মহাপাপ আর নেই। এ যে মনুষ্যত্বের স্বরূপের ওপর একটা মিথ্যের কলঙ্ক আরোপের প্রচেষ্টা। স্বামীজী এই ভুল বদলে দিতে চেয়েছেন।

শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মসমাজের শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিন্দু বিধবা আশ্রমের জন্য তিনি বিদেশে বক্তৃতা দিয়ে টাকা তুলে পাঠিয়েছেন কেবল খ্রিস্টান ধর্মান্তরিত ভারতীয় বিদুষী মহিলা রামাবাইয়ের তৈরি বিধবা আশ্রমকে ঔচিত্য দেখানোর জন্য। কারণ এই মহিলাসহ অন্যান্য খ্রিস্টধর্মাবলম্বী ও মিশনারিরা গলা মিলিয়ে ভারতীয় বিধবাদের দুঃখের অতিরঞ্জন করতেন, স্বামীজীর তা পছন্দ ছিল না।

হিন্দুধর্মের প্রচারে আনুকূল্য পাবার জন্য যতটুকু যিশু ভজনা দরকার স্বামীজী তাই করেছেন। তিনি জানতেন একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচার ধারায় অখণ্ড ভারতবর্ষ-সহ প্লাবিত হবে বিশ্বের নানান অংশ, তাই বড়োদিনের মতো দিনটির মধ্যে হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তনের বীজ বপন পূর্বেই করে দিলেন তিনি। এটা কলোনিয়াল প্রভাবমুক্তিরই সাধনা, সাধনা ২৫ ডিসেম্বরকে অতিক্রমের। এই দিনে বরং বেশি করে শ্রীরামকৃষ্ণের ও স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণ-মনন ও পূজন জরুরি। জরুরি শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামীজী যুগলবন্দির আরাধনা। খ্রিস্টের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে না দেখে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেই যিশুখ্রিস্টকে আবিষ্কার করার সাধনা বরং অতি উৎসাহীদের শুরু করা উচিত। সম্প্রীতির বার্তা দিতে খ্রিস্টানরা প্রভু যিশুর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে খুঁজে নিক।

রামনামে মত্ত স্বামীজী :

১৮৮৬ সালের ৭ জানুয়ারি; তখনও নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে ওঠেননি। কল্পতরু দিবস অতিবাহিত হয়েছে (১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি); শ্রীরামকৃষ্ণ তখন অসুস্থ। তাঁকে নরেন্দ্রনাথ বলছেন, এখন থেকে তাকে প্রত্যহ বলে দিতে হবে সেদিন সাধন ভজন কীভাবে করবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন তাঁর আদরের নরেনকে নিজের কুলদেবতা রামের ইষ্টমন্ত্র দিলেন। নরেনের শ্রীরাম ভজনা শুরু হলো। শ্রীম (মাস্টারমশাই)-র দিনলিপি উদ্ধৃত করে স্বামী প্রভানন্দ লিখেছেন সেই কথা। ১৩ জানুয়ারি শ্রীম দেখছেন, নরেন্দ্রনাথ পাগলের মতো রামনাম গাইছেন; অবশেষে ১৬ জানুয়ারি নরেনকে শ্রীরাম সন্ন্যাসীবেশে দর্শন দিলেন। আর ১৯ জানুয়ারি নরেন্দ্রনাথ-সহ নিরঞ্জন প্রমুখ সেই সন্ন্যাসীবেশী রামের মতো রামাইত সাধুর বেশ ধারণ করলেন। নরেনের গেরুয়াবেশে মা ভুবনেশ্বরী যারপরনাই চিন্তিত হলেন। নরেন যে সপার্ষদ সন্ন্যাসী হতে চান এবং তা ক্ষত্রিয় রামের সন্ন্যাস-বেশী রূপে তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পিতৃসত্য পালনের জন্য শ্রীরাম বনবাসী হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ক্ষাত্রধর্ম অক্ষুণ্ণই ছিল।

শ্রীরামের এই অনন্য রূপের মধ্যেই রয়েছে চিরন্তন ভারতবর্ষের শাশ্বত চিন্তন; শৌর্যশালী অথচ তাপসমালী। ভারতবর্ষের তপোবনে ভারতীয় সভ্যতার অনন্য উপাচার আর নগরে-রাজধানীতে বিক্রমশালী প্রজারঞ্জন রাজা— এ দুয়ের এক অমিত মেলবন্ধন হলো শ্রীরামের সন্ন্যাসরূপ। স্বামী বিবেকানন্দ যে বীর সন্ন্যাসী হয়ে উঠেছেন তা হয়তো এই রঘুবীরেরই সাধনায়। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় শিষ্যকে কুলের ইষ্টনাম দিয়ে সেই সাধনার ধারাকে পরিপুষ্ট করেছেন, বঙ্গপ্রদেশে শ্রীরাম সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। বঙ্গপ্রদেশের ধর্মীয় সংস্কৃতিতে শ্রীরামচন্দ্রকে পূজন-আরাধন যে প্রচলিত ছিল তা কবি কৃত্তিবাসের 'শ্রীরাম পাঁচালী'-ই অমোচ্য প্রমাণ। ■

শাক দিয়ে মাছ ঢাকার প্রচেষ্টা সফল হবে না

মণীন্দ্রনাথ সাহা

সুরেন্দ্র কুমার সিনহা

২৬ ডিসেম্বর ঢাকায় বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি-র মহাসচিব মির্জা ফকরুল ইসলাম আলমগির বলেছেন— 'ভারতের মোদী সরকার সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন এবং জাতীয় নাগরিকপঞ্জী করে মায়ানামারের রোহিঙ্গাদের মতো তাদের দেশের মুসলমানদেরও বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য করতে চায়।' তিনি আরও বলেছেন, মায়ানামার যেমন রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে নির্যাতনের মুখে রোহিঙ্গাদের রাষ্ট্রহীন করে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে, একইভাবে আমরা লক্ষ্য করছি ভারত নাগরিকত্ব আইন এবং এনআরসি জটিলতায় দেশের সংখ্যালঘু মুসলমানদের রাষ্ট্রহীন ঘোষণা করে জোর করে বাংলাদেশে পুশ ইন করার প্রক্রিয়া চালাচ্ছে।'

...ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পার্লামেন্টে তাঁর বক্তব্যের এক পর্যায়ে খালেদা জিয়া নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের নামোচ্চারণ করে শিষ্টাচার বহির্ভূত ভাবে সরাসরি অভিযুক্ত করে বলেন, 'বাংলাদেশে বিএনপি ক্ষমতায় থাকতে সেখানে ব্যাপকহারে সংখ্যালঘু নির্যাতন হয়েছে। নির্যাতনের শিকার সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় ভারতে পালিয়ে এসেছেন।' এর মাধ্যমে তিনি উদ্দেশ্যমূলক ভাবে বিএনপি-কে সাম্প্রদায়িক নিপিড়নকারী দল হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। ...অমিত শাহ ভারতীয় পার্লামেন্টে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তথ্য উপস্থাপন করেছেন।' এছাড়া আরও অনেক কথাই ফকরুল সাহেব বলেছেন।

তাঁর এই কথার প্রেক্ষিতে বলা যায়— ভারত কোনোদিনই ভারতের মুসলমানকে বাংলাদেশে পাঠাতে চায়নি। বরং বাংলাদেশের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকারের মদতে এবং সেখানকার জঙ্গি ও মৌলবাদী সংগঠনের দৌলতে বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের যেমন উৎখাত করা হয়েছে তেমনি গরিব মুসলমানদেরও ভারতে ঠেলে পাঠিয়েছে ভারতে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং অশান্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে। এমনকী রোহিঙ্গাদের মধ্যে থেকেও প্রায় চল্লিশ হাজার রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশিরা ভারতে পাঠিয়েছে। বাংলাদেশে হিন্দুরা যদি সুরক্ষিত থেকে থাকে তাহলে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে যে হিন্দুর সংখ্যা ছিল প্রায় ১৯ শতাংশ, তা ২০১৯ সালে প্রায় ৮ শতাংশে নেমে এসেছে কেন? যদি তারা ভারতে এসে না থাকে তাহলে ১১ শতাংশ হিন্দু গেল কোথায়? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বারকাত সাহেব তো বলেই দিয়েছেন, আগামী ২০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে হিন্দু বলে কেউ থাকবে না। তিনি সঠিক কথাই বলেছেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে প্রিয়া সাহা।

ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ'র মন্তব্যে মির্জা সাহেবের গোঁসা হওয়া স্বাভাবিক। কেননা সত্য বড়ো কঠিন ও নির্মম। তাই অনেকের মতোই তিনিও সত্য কথাটি হজম করতে পারছেন না। সেজন্য তিনি তাঁর গোঁসা চেপে রাখতে পারেননি। তাই তিনি বলেছেন, বিএনপি আমলে সংখ্যালঘুরা সুরক্ষিত ছিলেন। জবাবে অমিত শাহ বলেছেন, চাইলে প্রমাণ পাঠিয়ে দিতে পারি। ফকরুলের কথা শুনে আওয়ামি লিগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন— 'আমি হাসব না কাঁদবো ঠিক বুঝতে পারছি না। তারপর তিনি বলেন, আওয়ামি লিগ আমলে সংখ্যালঘুরা নিরাপদে থাকেন। বিদেশমন্ত্রী ড. আব্দুল

মোমেন বলেছেন, বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের কোনও দৃষ্টান্ত নেই। এই তিনজনের কথা শুনে বাংলাদেশের হিন্দু-সহ পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা হাসবে না কাঁদবে ঠিক বুঝতে পারছে না।

মির্জা ফকরুল সাহেবকে বাংলাদেশে বিএনপি সরকারের শাসনকালের কয়েকটি ঘটনার জন্য বিদেশি এবং বাংলাদেশি সংবাদপত্রের কিছু বক্তব্য তুলে দিচ্ছি। তার আগে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টও তুলে দিলাম।

২০০৩ সালের ৫ নভেম্বর দিল্লিতে সব রাজ্যের পুলিশের ডিজি-দের ৩৮তম সম্মেলনে বাংলাদেশ সম্পর্কে আইবি-র পেশ করা রিপোর্টের আলোচনা করেছিলেন ডিজি-রা। আইবি-র রিপোর্টে বলা হয়েছিল ২০০১ সালে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বাংলাদেশ ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে বিপদস্বরূপ হয়ে উঠেছে। বিপদের কারণগুলি হলো--- (১) বাংলাদেশে বিশাল সংখ্যক পাকিস্তানি গোয়েন্দার উপস্থিতি। (২) সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির উত্থান এবং (৩) জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির বাংলাদেশে ঘাঁটি গাড়া।'

এবারে দেখা যাক, বিদেশি সংবাদপত্র এবং বাংলাদেশের সংবাদপত্রের বিবৃতি। (১) আমেরিকার বিখ্যাত ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল লিখেছিল, 'বাংলাদেশে এক বিপ্লব চলছে যার মোকাবিলা করা না হলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ও অন্যান্য জায়গায় বিপদ দেখা দেবে।'

(২) নিউইয়র্ক পোস্ট লিখেছিল--- 'বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৮৩ শতাংশ মুসলমান। সেখানে চেষ্টা চলছে শরিয়ত ভিত্তিক সংবিধান-সহ ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ গড়ে তোলার। লক্ষ্য একটাই, বাংলাদেশের ইসলামিকরণ ঘটানো।'

(৩) দ্য হেরাল্ড পত্রিকায় সিআইএ-র মতে, আলকায়েদার শতশত যোদ্ধা আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে এসে সেখান থেকে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ছে।

(৪) আমেরিকার টাইম পত্রিকা লিখেছিল— 'এক বিরাট আলকায়েদা দল ঢাকায় এসেছে। আমেরিকার সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধে বাংলাদেশ এক নতুন বিপজ্জনক ফ্রন্ট হয়ে উঠতে পারে।

ভারতে নাগরিকত্ব আইন, এন আর সি ইত্যাদি ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এদেশের যে কোনো রাজনৈতিক দলের তাকেই সমর্থন করতে পারে আবার কেউ বিরোধিতাও করতে পারে। এটাই ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে সমালোচনা করার অধিকার অন্যদেশের নেই।

এছাড়া বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলিতে লেখা হয়েছিল--- 'সেখানকার হিন্দুরাই জঙ্গিদের প্রথম টার্গেট।' বিভিন্ন সংবাদপত্র হিন্দুদের খুন, জখম, ধর্ষণ ও ভিটেছাড়া করার অজস্র খবর ছাপিয়েছিল। শত শত হিন্দু পুরুষ ও নারী বর্বরতার স্বীকার হলেও খালেদা সরকার থেকেছে নীরব ও নিষ্ক্রিয়। বরং সরকারের শরিক দলগুলি রাস্তায় মিছিল করে স্লোগান দিয়েছিল— 'একটা দুটো হিন্দু ধরো, সকাল বিকাল নাস্তা করো।' এত কিছু দেখে ও জেনেও খালেদা সরকার ওইসব জঙ্গিদের বা শরিকদলের নেতাদের বিরুদ্ধে কখনও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। মির্জা সাহেব কি এই ঘটনাগুলি অস্বীকার করেন?

তবে শেখ হাসিনা সরকারের আমলে যে হিন্দুরা সুখে আছেন সেটাও বলা যাবে না। কেননা বাংলাদেশের মুসলমানদের কিছু কিছু লোক হিন্দু মেয়ে-বউদের ধর্মান্তরিত করা এবং ধর্ষণ করা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। সেখানকার হিন্দু মহাজোটের নেত্রী প্রিয়া সাহা স্বয়ং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের দ্বারা নির্যাতন বন্ধের জন্য। ফকরুল সাহেব নিশ্চয় জানেন যে তাঁর দেশের সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র সিনহা কর্মরত থাকাকালীন তাঁকে গৃহবন্দি করে রেখে সরকারি আধিকারিকদের দিয়ে মানসিক নির্যাতন ও শেষে সেনাবাহিনীর সদস্যদের দিয়ে লাথি মেরে দেশ থেকে বিতাড়নের কথা। কী অপরাধ ছিল বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার? তাঁর অপরাধ ছিল, তিনি আরও ছয়জন বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত সাত সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ গঠন করে, সরকারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দেওয়া এক মামলার রায় বহাল রেখেছিলেন। কই, সেই বেঞ্চের অন্য ছয় বিচারপতির বিরুদ্ধে তো সরকার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি? পদক্ষেপ নেয়নি তার কারণ তাঁরা ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের। আর সুরেন্দ্র কুমার সিন্‌হার অপরাধ ছিল--- তিনি হিন্দু। তাই তো? বাংলাদেশের কোনও সরকারই হিন্দুদের ভালো চোখে দেখে না। কেউ আঠারো, কেউ কুড়ি।

ভারতে নাগরিকত্ব আইন, এন আর সি ইত্যাদি ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এদেশের যে কোনো রাজনৈতিক দলের তাকেই সমর্থন করতে পারে আবার কেউ বিরোধিতাও করতে পারে। এটাই ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে সমালোচনা করার অধিকার অন্যদেশের নেই। সুতরাং কোনো দেশের বিরোধী দলের প্রথম শ্রেণীর নেতা হয়ে পররাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সমালোচনা করা মানায় না। বাংলাদেশের শাক দিয়ে মাছ ঢাকার প্রচেষ্টা সফল হবে না। ■

চিঠিপত্র

রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ধ্বংসকারীদের জন্য দাওয়াই

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে বর্তমান পরিস্থিতিতে এই পত্র লিখতে বাধ্য হচ্ছি। গত ১৩ ডিসেম্বর শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বেলেডাঙ্গা রেলস্টেশন ধ্বংসের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদীরা জেহাদের আগুন সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে দিয়েছে। এই ব্যাপারে আমার আন্তরিক অনুরোধ সিএবি বা সিএএ থেকে একদম পিছু হটবেন না। জেহাদি মদতপুষ্ট এই বিপ্লবকে ধ্বংস করতে হলে অডিয়ো ভিডিও প্রচার করে এই দেশদ্রোহীদের মুখোশ খুলে দিন। পুলিশের হাতে ক্যামেরা দিন যাতে ভবিষ্যতে এই প্রকার ঘটনা ঘটলে দুষ্কৃতীদের ছবি তুলে নেওয়া যায় এবং এদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা যায়। ঠাণ্ডা জল কামানের পরিবর্তে কড়া ধরনের রংয়ের মিশ্রণ বা গরম জল ছোড়ার ব্যবস্থা করা দরকার যাতে চামড়া পুড়ে যায়, কিন্তু মৃত্যু হবে না এবং তাদেরকে সহজেই গ্রেপ্তার করা যায়। আর একটা অনুরোধ, যে অঞ্চলে এইসব ধ্বংসাত্মক ঘটনা ঘটছে সেখানে পাইকারি ভাবে জরিমানা জারি করুন।

—**রবীন্দ্রনাথ দত্ত,**
কলকাতা-৬৪।

বাংলাদেশ থেকে হিন্দু বিতাড়নের নতুন পলিসি

একটি পত্রিকায় দেখতে পেলাম বাংলাদেশে নাকি দশ লক্ষের বেশি ভারতীয় বিভিন্ন ভাবে অর্থনৈতিক আয়ের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের জন্য ওখানে ঘাঁটি গেড়ে আছে। কথাটা শুনে ভালোই লাগলো। কিছু মানুষের কাছে বাংলাদেশ অর্থোপার্জনের একটি নির্ভরযোগ্য স্থান। বাংলাদেশ বর্তমানে অর্থনৈতিক দিক থেকে খুবই উন্নত দেশ। তাই এবার পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং ত্রিপুরা থেকে প্রচুর মানুষ ও দেশের শিল্প কারখানায় বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। বাংলাদেশ বর্তমানে সব দিক থেকে উন্নত। শুধু জল, খাদ্য, চিনি, লবণ, চাল, ডাল এবং মেডিক্যাল সুচিকিৎসার বড্ড অভাব। তাই বর্ডারে গেলে একজন সুস্থ মানুষ কান পাতলেই বুঝে যাবে, এত লোকের আমদানি কিসে। এরা নিশ্চয়ই প্রতিদিন ভারতে আসছে ম্যাজিক দেখার জন্য নয়। অনেক অভিজ্ঞ এবং জ্ঞানী মানুষের কাছে খবর আছে এরা আসছে চেন্নাই কলকাতা ব্যাঙ্গালুরুতে সুচিকিৎসার জন্য। এছাড়া প্রচুর লোক আসে জনমজুর খাটতে, রিকশা চালাতে এবং বিভিন্ন পাচারকারীর কাজ ও সুবিধা পাবার জন্য। একথা এদেশে বসবাসকারী প্রতিটি নাগরিকের জানা। তাই খুব জোরের সঙ্গে বিএনপি মহাসচিব ফখরুল ইসলাম আলমগির সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ভারতে কোনো অবৈধ বাংলাদেশি নেই, বরঞ্চ উল্টে ভারতের প্রচুর লোক বাংলাদেশে ভিড় করেছে জীবিকা নির্বাহের আশায়। ওদের প্রচার কার্যের এটাই উদ্দেশ্য, অবৈধ অভিবাসী ভারতে থাকে না, বাংলাদেশে থাকে। সেখানে ভারত থেকে যে সমস্ত লোককে ভয় দেখিয়ে পাঠানো হচ্ছে সেটা নিতান্তই এদেশের অর্থাৎ ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা। এমন ঘটতে থাকলে তারাও বাধ্য হবে তাদের দেশে কর্মের উদ্দেশ্যে যাওয়া ভারতীদের পুশব্যাক করতে। এ থেকে এটাই স্পষ্ট, এটা ওদের ও হিন্দু বিতাড়নের আবিষ্কৃত নতুন এবং নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি।

—**স্বপন কুমার ভৌমিক,**
শান্তিপুর।

শুধু মুসলমানদেরই প্রমাণপত্র দেখাতে হবে কেন?

দীর্ঘ বিতর্কের পর রাজ্যসভা ও লোকসভায় নাগরিকত্ব বিল পাশ হয়ে আইনে পরিণত হলো। এই আইন অনুযায়ী হিন্দুদের কোনো নাগরিকত্বের প্রমাণ পত্র পেশ করতে হবে না। পেশ করতে হবে শুধু মুসলমানদের।

প্রশ্ন ওঠে, এইরকম বৈষম্যমূলক আইন কেন পেশ করা হলো? ভারতীয় সংবিধানের ১৪তম ধারায় ও অন্যান্য ধারাতেও ধর্ম, লিঙ্গ ও জাত নিয়ে কোনো প্রকার বৈষম্য চলবে না— এই মর্মে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যেখানে।

এর উত্তর পেতে হলে ইতিহাসের দিকে নজর ফেরাতে হবে। ইতিহাস বলছে যে, সংবিধানে তখনই বিশেষ প্রয়োগ ঘটতে পারে, যখন সমাজ বিজ্ঞানী, আইনজীবী, পুলিশ, গোয়েন্দরা কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট সরকারের কাছে তুলে ধরেন।

পূর্বের রিপোর্ট অনুযায়ী দেশের বেশ কিছু জাতিগোষ্ঠী নানা ভাবে বঞ্চিত হচ্ছিল ও পিছিয়ে পড়ছিল। তাই ১৪নং ধারাকে কিছুটা উপেক্ষা করেই বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষণ করা হলো। ইমামদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করা হলো। কত রকম আইন আনা হলো যথা মিসা, টাডা।

এক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছে। ভারতে জালনোটের কারবারের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি জড়িত যারা--- তারা হলো মুসলমান অনুপ্রবেশকারী। গোপাচারের সঙ্গে সবচেয়ে জড়িতরা মুসলমান অনুপ্রবেশকারী। বাদুড়িয়া, কালিয়াগঞ্জ, দেগঙ্গা, ধুলাগড়, মেটিয়াবুরুজ দাঙ্গায় জড়িতদের অনেকেই অনুপ্রবেশকারী মুসলমান। ধর্ষণ খুন ডাকাতি, চুরি, ছিনতাই ইত্যাদির সঙ্গে জড়িতদের বৃহৎ অংশ অবৈধ মুসলমান অনুপ্রবেশকারী।

তাহলে কেন এদের জন্য এন আর সি-র নথি দেখতে চাওয়া হবে না? আরও আছে। শুধু অনুপ্রবেশকারী মুসলমানই নয়, ভারতে বসবাসকারী ও অন্যদেশে বসবাসকারী মুসলমান সম্পর্কেও ইতিহাস ঘাঁটা দরকার।

অন্ধের মতো সর্বধর্ম সমান, যে রাম সেই আল্লা— এসব আওড়ালেই তো চলবে না। ইতিহাস বিমুখতাও একটা বড়ো পাপ। সে পাপের শাস্তিও খুব বড়ো।

দেশভাগ সেই পাপের বড়ো শাস্তি। ৪৬-এর দাঙ্গায় নোয়াখালিতে কারা হাজার হাজার হিন্দু নিধন করেছিল। উত্তরটা হলো মুসলমানরা। একই বছর গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস-এ ২০ হাজার হিন্দুকে কেটেছিল মুসলমানরা। নালন্দা ও তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় ভেঙেছে কারা--- মুসলমানরা। তাজমহল, লালকেল্লা কুতুবমিনার কারা দখল করে নিজেদের নামে চালিয়ে দিয়েছে? হিন্দু দেব-দেবীদের নিয়ে কারা কুৎসামূলক সাহিত্যরচনা করেছে? মুসলমানরা ও সেকুলার হিন্দুরা। ঢাকার রামনা কালীবাড়ি মন্দির ভেঙেছে কারা--- মুসলমানরা। গোধরায় ট্রেনে আগুন লাগিয়ে ৫৮ জন করসেবকদের মেরেছে কারা? বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রতিক্রিয়ায় হাজারো হিন্দু নিধন করেছে কারা? মুম্বাই, আমেদাবাদ, অক্ষরধাম, দশাশ্বমেধ ঘাটে বিস্ফোরণ ঘটালো কারা? সব কটারই একই উত্তর তারা হজরত মহম্মদের অনুগামী। এখনো তিন তালাক বিলের বিরোধিতা করছে কারা? আমেরিকায় টুইন টাওয়ার ওড়ালো কারা? লন্ডনের মেট্রো রেলে বিস্ফোরণ ঘটালো কারা? ফ্রান্সে শার্লি পত্রিকার অফিসে হামলা চালালো কারা? পাকিস্তানের স্কুলে প্রবেশ করে ১৩৫ জন শিশুকে হত্যা করলো কারা? ভারতে পার্লামেন্ট আক্রমণ করলো আফজল গুরুরা। তাজ হোটেলে হামলা চালালো আজমল কাসভরা। পুলওয়ামার ৫০ জন জওয়ান হত্যা করলো, পাঁচ লক্ষ কাশ্মীরি পণ্ডিতকে তাড়ালো কারা? রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীরা কোন জাতির লোক? খাগড়াগড় বিস্ফোরণে কোন গোষ্ঠীর লোকেরা জড়িত ছিল? মিশরের মসজিদে ঢুকে ২৫০ জন নামাজিকে মারলো কারা? সবগুলোরই উত্তর হলো— মুসলমানরা।

ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী আর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী— এই কটি হত্যা মুসলমানরা করেনি। খালিস্তানি, এলটিটিই আর আলফা এই কয়টি উগ্রপন্থী সংস্থা ইসলামিক নয়। বাকি ৩৩ শতাংশ সন্ত্রাসবাদীই তো ভাইজানরা।

এদের কেন সন্দেহ করা হবে না? কেন তাদের জন্য নথি দেখতে চাওয়া হবে না? বরং ভবিষ্যতে এর চাইতেও কড়া ব্যবস্থা নিলে কিছু বলার থাকবে না। ভারতকে ভবিষ্যতে হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করে ইসলামকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক--- যেমনটা আলবানিয়া ও চীন দেশে করা হয়েছে।

—রবীন সেনগুপ্ত,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

শুধুমাত্র এনকাউন্টারে হোক ধর্ষকদের শাস্তি

পশু চিকিৎসক ডাঃ প্রিয়াঙ্কা রেড্ডিকে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারার অপরাধে চার ধর্ষককে এনকাউন্টারে মেরেছে তেলেঙ্গানা পুলিশ। সমস্ত ভারতবাসী তেলেঙ্গনা পুলিশ বাহিনীকে স্যালুট দিয়েছে আর ফুল ছিটিয়ে, ফুলমালা পরিয়ে মিষ্টি খাইয়েছে মা-বোনেরা। এই ভেবে খুশি তাঁরা আশ্বস্ত হয়েছেন যাক্ এখন থেকে নারীর সম্ভ্রম বাঁচবে। দেশের তরুণীরা খুশির মিছিল বের করেছেন এবং পুলিশদের সাবাসি দিয়েছেন। এইভাবে একটি সাহসী পদক্ষেপের পক্ষে দেশবাসী সম্মতি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, এদেশে কতশত মা-বোন, শিশুকন্যা ধর্ষিতা হয়েছে, এখনো হচ্ছে তাঁর কোনো হিসেব নেই। এছাড়া ধর্ষণ মামলা যেগুলি আদালতে এখনও বিচারাধীন, সেগুলি শুধু তারিখের পর তারিখের জন্য দিন গুনছে। কেবলমাত্র এই এনকাউন্টারের পর বুদ্ধিজীবী মহলে শোরগোল পড়েছে যে আইন বলে কিছু আর রইল না। তবে পুলিশের এই কাজের কারণেই সারা ভারতের পুলিশের দুর্নাম কিছুটা ঘুচলো বলে মনে করছেন সাধারণ মানুষ। একমাত্র তাঁরাই এই এনকাউন্টারে খুশি হয়েছেন যাদের ঘরের মেয়েদের প্রিয়াঙ্কার মতো নৃশংস ঘটনার শিকার হতে হয়েছে। কত শত ধর্ষণ মামলা আজও আদালতের চত্বর থেকে বের হতে পারছে না। মামলাগুলি ঝুলে থাকায় কারণ কী? 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'— এদেশে কত বিচারের রায় দোষীর পক্ষে গেছে শুধু অর্থের লালসায় সত্যকে আড়াল করে। এভাবেই দোষীরা পার পেয়ে যায় আবার তাঁরা অপরাধ করতে শুরু করে। এত সুন্দর একটি সিদ্ধান্তে যেন এখানকার কিছু সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী এবং কিছু মানবাধিকার কমিশনের সদস্যের একাংশের মনে দুঃখের ছায়া নেমে এসেছে। এই অপরাধীদের মধ্যে এক অপরাধীর মা তো মিডিয়াতে তাঁর অপরাধী ছেলেকে গুলি করে মারার নিদান দিয়েছেন। এই রকম আপদ যত বিদায় হয় ততই সমাজের মঙ্গল, মা-বোনেদের মঙ্গল, দেশের মঙ্গল। আমি ধরেই নিলাম তেলেঙ্গনা পুলিশ খুবই অন্যায় করেছে, তাহলে কেন নিরপেক্ষ তদন্তের ক্ষেত্রে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তদন্তকারী সংস্থাকে। এই সারদা, নারদা ও রোজভ্যালি কেলেঙ্কারিতে কত অসহায় মানুষজনের অর্থ নয়ছয় হয়েছে। সেই তদন্তে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছেন সিবিআই অফিসাররা। পাশাপাশি নিম্নশ্রেণীর ঘরে ঘরে রোজ কত অসহায় শিশুকন্যা, বোন মা ও দিদিমা ধর্ষিত হচ্ছে সেগুলি খবরে উঠে আসে না। কারণ, তাদেরকে পুলিশের কাছে না যাবার হুমকি দেওয়া হয়। সবদিক খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে সমাজের ক্ষমতাবান লোকেরাই এদের আশ্রয়দাতা। মহিলারা কোথাও নিরাপদ নয়, কী ঘরে কী বাইরে! সেই মোঘল আমলেও নারীরা অত্যাচারিত হয়েছিল, আজও হচ্ছে।

তাই, এখন এনকাউন্টার হলো ধর্ষকদের আসল ওষুধ। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ, শুধুমাত্র মহিলাদের শ্লীলতাহানির রক্ষার্থে অস্ত্র রাখার আইন পাশ করা হোক। সবশেষে বলব, এনকাউন্টারই হোক শুধুমাত্র ধর্ষকদের শাস্তি।

—রাজু সরখেল,
দিনহাটা, কোচবিহার।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

মহিলাদেরও প্রয়োজন পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাবার

সুতপা বসাক ভড়

পুরুষদের মতো মহিলাদেরও পুষ্টিগুণ যুক্ত খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। অপুষ্টির শিকার গর্ভবতী মহিলাদের সন্তানও দুর্বল হয়। দুর্বল নবজাত কন্যাসন্তান একই ভাবে যদি অস্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে বড়ো হয়, তাহলে সে একজন দুর্বল যুবতী হয়ে আবার একটি দুর্বল সন্তানের জন্ম দেয়। এই ভাবে একটি পরিবার তথা সমাজ তথা একটি দেশে দুর্বল নাগরিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলস্বরূপ, একটি দুর্বল রাষ্ট্র নানান সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ে।

পুরুষদের তুলনায় মহিলারা এবং বালিকারা অপুষ্টির মতো সমস্যায় বেশি আক্রান্ত হয়। এটি একটি জটিল সমস্যা এবং এর অনেকগুলি কারণ আছে—

শারীরিক ভাবে এবং প্রাকৃতিক কারণে মহিলাদের শরীরে রক্তাল্পতা একটি অতি সাধারণ ঘটনা। এছাড়া সন্তানের জন্মের সময় মায়ের শরীর থেকে আয়রন, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন এবং প্রোটিনের মতো উপযোগী উপাদান সন্তানের শরীরে পৌঁছে যায়। এই সময় মহিলাদের খাওয়া-দাওয়া সঠিক না হলে, তারা সহজেই অপুষ্টির শিকার হয়ে পড়বে। একটি সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে, ভারতের এক তৃতীয়াংশ মহিলা অপুষ্টিতে ভুগছে।

সাধারণত কোনো পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা না থাকলে সেই পরিবারের মহিলারা পৌষ্টিক আহার পান না। এই ধরনের ঘটনা পরিবারের মেয়ে এবং গৃহিণীদের ক্ষেত্রে ঘটতেই থাকে।

আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে পুরুষদের তুলনায় শিক্ষার হার কম। শিক্ষার অভাবে পুষ্টিকর আহার শরীরের জন্য কতটা প্রয়োজনীয়, সেই বোধ মহিলাদের থাকে না। ফলে নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি সজাগ না থাকার জন্য তাদের শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ ঠিকমতো হয় না।

আবার, বেশ কিছু সচ্ছল পরিবারেও বাড়ির পুরুষ সদস্যদের খাওয়া-দাওয়ার দিকে বেশি খেয়াল ও যত্ন নেওয়া হয়। মহিলাদের রক্তাল্পতা ও অপুষ্টি অতি সাধারণ ঘটনা ভেবে অগ্রাহ্য করা হয়ে থাকে। পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য শরীরে না পৌঁছালে নানারকম অসুখের সূত্রপাত হয়। অপুষ্টিজনিত কিছু সাধারণ লক্ষণ হলো— অপেক্ষাকৃত দুর্বল হওয়া, ওজন ঠিকমতো না থাকা, বার বার সংক্রমণ হওয়া, ক্লান্তিবোধ হওয়া, শরীরে ফ্যাকাশে ভাব ইত্যাদি। এগুলি সাধারণত রক্তাল্পতার লক্ষণ, এছাড়া চুলপড়া, বার বার পেট খারাপ হওয়া, হাড়ে, মাংসপেশীতে ব্যথা অনুভব করা শারীরিক দুর্বলতার লক্ষণ।

মহিলাদের খাবারে ১৮-২৭ মিলিগ্রাম আয়রন প্রয়োজন যা সবুজ শাকসবজি, ডাল ইত্যাদিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রতিদিন ১০০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম প্রয়োজন, যা সাধারণত দুধ এবং দুগ্ধজাত পদার্থ থেকে পাওয়া যায়।

আমাদের একটু নিজেদের দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। রান্নাঘরে সামান্য একটু সচেতন হলে আমরা নিজেদের স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে পারব। যেমন— অনেক সময় ধরে বেশি আঁচে খাবার না বানানো; লোহার কড়াইতে রান্না করা, খোসাযুক্ত ডাল খাওয়া এবং রান্নার আগে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নেওয়া। খাবার খাওয়ার ঠিক পরেই চা-কফি না খাওয়া, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানারকম সবজি, ডাল, মাছ খাওয়া ইত্যাদি। খাবার বার বার গরম করলেও তার পুষ্টিগুণ কমে যায়।

খুবই সাধারণ কিছু নিয়ম, যা আমরা সবাই জানি, সেগুলো যদি দৈনন্দিন জীবনে পালন করা যায়, তাহলে আমরা সুন্দর-সুস্থ পরিবার গঠন করতে পারব। মহিলারা পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু, সেজন্য তাঁদের সুস্থ থাকা ভীষণ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পরিবারের পুরুষ সদস্যদেরও একটু সহযোগিতার প্রয়োজন। কারণ মহিলারা অনেক সময় সবাইকে ভালো রাখতে গিয়ে নিজেদের কথা ভুলে যান। সেজন্য যিনি সবার জন্য হাসিমুখে পরিশ্রম করে চলেছেন, তাঁকে সুস্থ রাখার দায়িত্ব পরিবারের। ■

নিতম্বের ব্যথা ও হোমিওপ্যাথি

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

আমরা বিভিন্ন সময়েই হিপ পেইন বা নিতম্বের ব্যথায় ভুগি। কিন্তু শুধুমাত্র এক্সারসাইজ, ওজন কমানো ও ওষুধ দিয়ে এই ব্যথার নিরাময় সম্ভব হয় না। এই ব্যথা কমাতে বেশ কয়েকটি খাবারের কার্যকরী ভূমিকায় রয়েছে। হার্টের সুরক্ষার জন্য সর্বাধিক পরিচিত ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধি খাবার হিপ পেইন ও সংলগ্ন এলাকার প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। অস্থিসন্ধির প্রদাহ কমায় বলেই ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার খেলে হিপ পেইনও কমে।

হিপ পেইনের জন্য প্রয়োজনীয় ডায়েট

কোন কোন খাবার এড়িয়ে চলবেন

ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিড যুক্ত খাবারগুলোকে প্রথমেই বাদ দেওয়া উচিত। 'যদিও বেশ কিছু ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজন, তাহলেও বলব হিপ পেইনের সমস্যা কমাতে ওমেগা থ্রি ও ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিডের সঠিক ভারসাম্য ডায়েটে রাখতে হবে, না হলেই ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিড বেশি গেলেই হিপের প্রদাহ ও ব্যথা জনিত সমস্যায় ভুগতে হবে। পাশাপাশি প্রক্রিয়াজাত খাবার বাদ দিতে হবে। বিশেষ কয়েকটি দুগ্ধজাত খাবার ও রেডমিট। কেননা এগুলোতে ফ্যাট বিভিন্নভাবে থাকে, যেমন স্যাচুরেটেড ফ্যাট, ট্রান্স ফ্যাট কিংবা হাইড্রোজিনেটেড অয়েল। এগুলি প্রদাহ ও ব্যথা বাড়ায়।

কোন কোন খাবার খাবেন : হাড় মজবুত রাখতে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডের একটি ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। এটি হিপের প্রদাহ কমায় আর প্রদাহ কমলেই ব্যথা কমবে। যেসব খাবারে ওমেগা থ্রি ফ্যাটিতে পাওয়া যায় তা হলো— ঠাণ্ডাজলের ফ্যাটযুক্ত মাছ যেমন স্যামন,

ম্যাকারেল, সার্ডিন, টুনা, অ্যাংকোভিস। জলপাইয়ের তেল, তিসির তেল ও ক্যানোলা অয়েলে। ব্রকোলি, লেটুস, পালংশাকের মতো পাতাযুক্ত সবুজ সবজিতে। আখরোট ও তিসি গোটা খেলেও শরীরে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডের চাহিদা পূরণ হয়।

রান্নার পদ্ধতি : হিপ পেইনের সমস্যা কমাতে রান্নার পদ্ধতিও গুরুত্বপূর্ণ। জলপাইয়ের তেল ও তিসির তেলই এই রোগীদের রান্না করতে বলা হয়, ঘি বা মাখনের বদলে। সামান্য মাছ বেকড ফিশ হিসেবে খাওয়া যেতে পারে, এতে অস্থিসন্ধির সমস্যা অনেকটাই কমবে। বেশকিছু মশলা দিয়ে রান্না করলেও সমস্যার সমাধান হবে, যেমন হলুদ। এর উল্লেখ ভারতীয় আর্য়ুভেদ শাস্ত্রে রয়েছে যা প্রাচীনকাল থেকে ঔষধি হিসেবে কাজ করে। কেননা এটি ইনফ্লামেশন তথা প্রদাহ কমায়। অ্যান্টি ইনফ্লামেটারি ডায়েটের মধ্যে আদাগুঁড়ো কিংবা হলুদ ও আদার সাপ্লিমেন্টও যোগ করা যায়।

হোল গ্রেনস খান : লুয়িসভিলের পুষ্টিবিদ সান্দ্রা মেয়োরোউইটচ- এর মতে, 'যাদের রক্তে শর্করা খুব বেশি ওঠানামা করে, কিংবা খুব বেশি থাকে, তাদের শরীরে প্রদাহ বেশি হয়।' আর সেজন্যই তাঁর বক্তব্য, 'শরীরের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ঠিক রাখতে হোল গ্রেনস সমৃদ্ধ খাবার যেমন হোল গ্রেনস পাউরুটি ও সিরিয়াল, সঙ্গে ব্রাউন রাইস খাওয়া উচিত। এগুলি হিপের ইনফ্লামেশন ও পেইন কমায়। রিফাইন্ড গ্রেনস যুক্ত খাবার (বিশেষ করে ময়দার তৈরি রুটি পাউরুটি) থেকে যখন কেউ হোল গ্রেনস ফুডে চলে যান তখন শরীরের গ্লাইসেমিক ইনডেক্সেও পরিবর্তন হয়। হোল গ্লেস ফুড লো গ্লাইসেমিক ইনডেক্স যুক্ত এগুলি রক্তে শর্করা লেভেলকে বাড়তে দেয় না, যেটি প্রদাহ হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ।

কোন কোন খাবার যোগ করবেন : ফল ও সবজি যে কোনও স্বাস্থ্যকর ডায়েটের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। হিপ পেইন কমানোর ক্ষেত্রে এগুলির ভূমিকা রয়েছে। আসলে এগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার যা আপনার শরীর থেকে সেইসব উপকরণকে বাদ দিয়ে দেয়, যেগুলি ইনফ্লামেশনের কারণ। সান্দ্রা মেয়োরোউইটচ জানান, 'প্রতিদিন একটা বা দুটো করে মরসুমি ফল খওয়া জরুরি। সঙ্গে একবাটি স্যুপ।' গ্লুকোসেমাইন ও কনড্রটিন সাপ্লিমেন্টও হিপ পেইনের সমস্যা কমাতে অনেকে খান। তবে তার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ করে নেবেন আপনার কোনও কিছুতে অ্যালার্জি আছে কিনা, থাকলে এগুলি খাওয়া যাবে না।

সুতরাং সবশেষে বলা যায়, আপনার ডায়েট যদি পর্যাপ্ত ফল, সবুজ পাতাযুক্ত সবজি, ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ মাছ ও হোল গ্রেনস ভর্তি থাকে, তাহলে শরীরের সামগ্রিক ওজন ইনফ্লামেশন দুই-ই কমবে। হিপ পেইনের সমস্যাও আপনাকে কাবু করতে পারবে না।

চিকিৎসা : কারণ, লক্ষণ ও মায়াজম মিলিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করলে এই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। ▮

নাগরিকত্ব আইনের সমর্থনে সুশৃঙ্খল জনজোয়ারের সাক্ষী রইল কলকাতা

অভিমন্যু গুহ

গত ২৩ ডিসেম্বর কলকাতার বুকে ভারতীয় জনতা পার্টি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সমর্থনে অভিনন্দন যাত্রার আয়োজন করে। মধ্য কলকাতার হিন্দ সিনেমা থেকে উত্তরের শ্যামবাজার পর্যন্ত কাতারে কাতারে লোকের ভিড়ে মুখ্য আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন দলের সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি জেপি নাড্ডা। লক্ষাধিক মানুষের ভিড়ে উজ্জীবিত নাড্ডা কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন রাজ্যের শাসক দল ও তার দলনেত্রীকে। তিনি বলেন এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিন তালাক বিলের বিরোধিতা করেছিলেন, এখন নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করছেন এসবের একটাই মূল লক্ষ্য, সেটি হলো মুসলমান ভোট। প্রশাসনিক মদতে যেভাবে পশ্চিমবঙ্গে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে তারও কড়া ভাষায় নিন্দা করেন শ্রী নাড্ডা। তিনি বলেন, এই আইন মানুষকে নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য, নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার জন্য নয়।

শ্রী নাড্ডা এও বলেন, রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা থাকলেই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন-পরবর্তী হিংসা রুখে দেওয়া সম্ভব হতো। কিন্তু ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে মমতা ব্যানার্জি তাঁর প্রশাসনকে সক্রিয় হতে দেননি, হিংসার প্রতিবাদও করেননি। এদিন নাড্ডার সঙ্গে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীয়। এঁরাও তাঁদের বক্তব্যে রাজ্যের শাসক দলনেত্রীকে তুলোধনা করেন।

অনেকদিন ধরেই চলছিল কুৎসা রটনা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাম ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দাবি করেছিলেন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সংবিধান-বিরোধী, মুসলমান-বিরোধী। এই আইনের জোরে নাকি কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববঙ্গ থেকে শরণার্থী হয়ে আসা অমুসলমান নাগরিকদেরও বাংলাদেশে তাড়িয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করছে। বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষকে খেপিয়ে তোলার জন্য রীতিমতো পরিকল্পনা করে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে এ রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলি। এদিন, বিজেপির সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি জেপি নাড্ডা বিরোধীদের প্রতিটি অভিযোগ খণ্ডন করেন। তিনি স্পষ্ট বলেন, এই আইন কে শরণার্থী আর কে অনুপ্রবেশকারী তা নিশ্চিত করতে চায়। এই আইনের সঙ্গে ভারতে দীর্ঘকাল বসবাসকারী বৈধ মুসলমানদের কোনও সম্পর্ক নেই।

বিজেপির মিছিলে মতুয়া, নমশূদ্র এবং রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। ঢাকঢোল বাজিয়ে, নেচে গেয়ে তারা তাদের আনন্দ প্রকাশ করেন। বস্তুত মতুয়াদের নাগরিকত্বের দাবি অনেকদিনের। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ক্ষমতায় এলে তারা নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ করে মতুয়া নমঃশূদ্র এবং রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষদের দাবিকে

মান্যতা দেবে। বনগাঁ কেন্দ্র থেকে জয়ী হন বিজেপির শান্তনু ঠাকুর। বিজেপি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করায় মতুয়ারা স্বভাবতই খুশি। মিছিলে বেশ কিছু মুসলমান নাগরিককেও দেখা গেছে। তারা যেমন মানবিক এবং দৃঢ় পদক্ষেপের জন্য মোদী সরকারের প্রশংসা করেছেন, ঠিক তেননি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের নামে অহেতুক কুৎসা রটনা করার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিন্দাও করেছেন। এদিন সকাল থেকেই কলকাতার আকাশ গেরুয়া পতাকায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। রাস্তাঘাট আর সভা প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে জয় শ্রীরাম আর ভারতমাতা কী জয় ধ্বনিতে। এমন বিশাল অথচ সুশৃঙ্খল জনজোয়ার কলকাতা অনেকদিন দেখেনি।

লক্ষণীয়, নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতায় প্রতিদিনই কলকাতায় পথে নামছেন মমতা, আর নাকাল হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। তিনি রাজাবাজার থেকে মল্লিকবাজার পর্যন্ত মিছিল করলেও সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী কাঁকুড়গাছি, ফুলবাগান, বেলেঘাটা সিআইটি রোডে যান চলাচল বন্ধ রাখা হচ্ছে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, মমতা পথে নেমেছেন, এটা ট্যাঁড়া পিটিয়ে প্রচারের জন্যই প্রশাসনের এমন পদক্ষেপ। অন্যদিকে বিজেপি দেখিয়ে দিয়েছে লক্ষাধিক মানুষের ভিড়েও সুশৃঙ্খল ভাবে মিছিল করা যায়। হেভিওয়েট তারকা নেতৃত্ব থাকা সত্ত্বেও এতে সাধারণ মানুষের কোনও অসুবিধা হয় না, এমনটাই মনে করেন ওয়াকিবহাল মহল।

চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা।

জেলায় জেলায় বিজেপির মিছিলে মানুষের ঢল

আদিনাথ ব্রহ্ম

শুধু কলকাতা নয়, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের সমর্থনে জনজোয়ার প্রত্যক্ষ করল উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। গত ২৩ ডিসেম্বর বিজেপির সর্বভারতীয় কার্যকরী সভাপতি জেপি নাড্ডার নেতৃত্বে কলকাতায় মহা মিছিলের ডাক দিয়েছিল বিজেপি। ইদানীংকালের কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো মিছিলেই এত জনসমাগম হয়নি, যা গত ২৩ ডিসেম্বর কলকাতায় বিজেপির মহামিছিলে হয়েছিল। তবে, এর পরপরই বিভিন্ন জেলায় বিজেপির মিছিলগুলি জনজোয়ার এবং স্বতঃস্ফূর্ততায় নজর কেড়েছে। কলকাতার পর দ্বিতীয় মহামিছিলটি হয় উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে। শিলিগুড়ির স্থানীয় মানুষই বলছেন, এই মিছিলে যে জনসমাগম হয়েছিল, ইদানীংকালে অন্য কোনো মিছিলে তা দেখা যায়নি। মিছিলের জনসমাগম যে স্বতঃস্ফূর্ত ছিল শুধু তাই নয়, রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে

থাকা মানুষজনও এই মিছিলের প্রতি তাদের সমর্থন জানিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্গ বলে পরিচিত কাঁথিতেও বিজেপি বিশাল মিছিল বের করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। রাজনৈতিক বিচারে কাঁথিতে বিজেপির এই মিছিলের গুরুত্ব অপরিসীম। এই বিশাল মিছিলগুলিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তার সঙ্গে ছিলেন সংশ্লিষ্ট জেলা নেতৃবৃন্দও। এছাড়াও গত ২৯ ডিসেম্বর বনগাঁয় সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের সমর্থনে বিশাল জনসভা করে বিজেপি। এই জনসভাতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভাপতি দিলীপবাবু।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দিলীপবাবু বলেন, 'সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতার নামে সমগ্র রাজ্য জুড়ে তাণ্ডব চলেছে। আর এই অশান্তিতে ক্রমাগত উস্কানি দিয়ে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। নাগরিকত্ব আইন সম্পর্কে লাগাতার মিথ্যা প্রচার এবং

শিলিগুড়ি

মানুষকে বিভ্রান্ত করে এসেছেন তিনি।' দিলীপ ঘোষ আরও অভিযোগ করেছেন, অনুপ্রবেশকারীদের রাস্তায় নামিয়ে তাণ্ডব করিয়েছে রাজ্যের শাসক দলই। এইসব গণ্ডগোল থামাতে রাজ্য সরকার কোনো ব্যবস্থা তো নেয়ইনি, বরং চুপচাপ থেকে সব দেখেছে।

দিলীপবাবু বলেন, 'সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন কাউকে তাড়িয়ে দেবার জন্য তৈরি হয়নি। এই আইনে কোথাও বলা নেই মুসলমানদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে। বরং বাংলাদেশ থেকে যে হিন্দু শরণার্থীরা অত্যাচারিত হয়ে এদেশে এসেছে, মানবিক কারণেই তাদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এই আইনে।'

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের সমর্থনে প্রচার করে মানুষের কাছে প্রকৃত তথ্য তুলে ধরতে এলাকায় এলাকায় ভারতীয় জনতা পার্টি পথসভা এবং মিছিলের আয়োজন করছে। প্রতিটি জনসভায় এবং মিছিলে মানুষে ভিতর থেকে দারুন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন পথসভায় রাজ্যস্তরের নেতৃবৃন্দ এবং সাংসদরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন ও বক্তব্য রাখছেন। ■

কাঁথি

ঝুক নহী সকতে

টুট সকতে হ্যাঁয় মগর ঝুক নহী সকতে।
সত্য কা সংঘর্ষ সত্তা সে,
ন্যায় লড়তা নিরঙ্কুশতা সে,
অন্ধেরে নে দী চুনৌতি হ্যায়,
কিরণ অন্তিম অস্ত হোতী হ্যায়।

দীপ নিষ্ঠা কা লিয়ে নিষ্কম্প,
বজ্র টূটে যা উঠে ভূকম্প,
যহ বরাবর কা নহী হ্যায় যুদ্ধ,
হম নিহত্থে শত্রু হ্যাঁয় সন্নদ্ধ,
হর তরহ কে শস্ত্র সে হ্যায় সজ্জ,
ঔর পশুবল হো উঠা নির্লজ্জ।

কিন্তু ফির ভী জূঝনে কা প্রণ,
পুনঃ অঙ্গদ নে বঢ়ায়া চরণ,
প্রাণপণ সে করেঙ্গে প্রতিকার,
সমর্পণ কী মাঙ্গ অস্বীকার।

দাঁও পর সব কুছ লগা হ্যায়, রীক নহী সকতে।
টূট সকতে হ্যাঁয় মগর হম ঝুক নহী সকতে।

কদম মিলাকর চলনা হোগা

বাধায়েঁ আতী হ্যাঁয় আয়েঁ,
ঘিরে প্রলয় কী ঘোর ঘটায়েঁ,
পাঁয়োঁা কে নীচে অঙ্গারে,
সির পর বরসেঁ যদি জ্বালায়েঁ,
আগ লগা কর জলনা হোগা।
কদম মিলা কর চলনা হোগা।। ১।।

হাস্য-রুদন মেঁ, তূফানোঁ মেঁ,
অমর অসংখ্যক বলিদানোঁ মেঁ,
উদ্যানোঁ মেঁ, বীরানোঁ মেঁ,
অপমানোঁ মেঁ, সম্মানোঁ মেঁ,
উন্নত মস্তক উভরা সিনা,
পীড়ায়োঁ মেঁ পলনা হোগা।
কদম মিলাকর চলনা হোগা।। ২।।

উজিয়ারে মেঁ, অন্ধকার মেঁ,
কল কছার মেঁ, বীচ ধার মেঁ,
ঘোর ঘৃণা মেঁ, পূত প্যার মেঁ,
ক্ষণিক জীত মেঁ, দীর্ঘ হার মেঁ,
জীবন কে শত শত আকর্ষক,
অরমানোঁ কো দলনা হোগা।
কদম মিলাকর চলনা হোগা।। ৩।।

সস্ত্রীক ঘনশ্যাম বেরিওয়ালের সঙ্গে বাজপেয়ী।

ভারতমাতার কৃতীসন্তান অটলবিহারী বাজপেয়ী

আরতি নন্দী

২৫ ডিসেম্বর গোয়ালিয়র শহরের শিক্ষক কুঞ্জবিহারীর গৃহটি বহু মানুষের আনন্দ-উচ্ছ্বাস ও শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল এক নবজাতকের আবির্ভাবে। আত্মীয় পরিজন সকলেই জ্যোতির্ময় মুখণ্ডল দেখে চমৎকৃত। নির্দিষ্ট সময়ে শিশুর নামকরণ হলো 'অটল'। সাত ভাই-বোনের মধ্যে চলনে-বলনে-স্বভাবে অটল ছিলেন ধীর-স্থির শান্ত বালক। গোয়ালিয়রের বিদ্যালয়ে পড়ার সময় ১৫ বছর বয়সে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন। পরবর্তীকালে তিনি সঙ্ঘের প্রচারক হয়েছিলেন।

বিদ্যালয় থেকে মহাবিদ্যালয়, তারপর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এ-তে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে পরবর্তী জীবনে সংগঠনের কখনও সৈনিক, কখনও সেনাপতি— প্রতিটি ওঠানামায় অটল থেকেছেন তিনি। কখনও হার মানেননি— 'হার নহি মানুঙ্গা'— সরস্বতীর বরে তাঁর কথা ছিল কবিতা। তাঁর রাজনীতি কবিতা হয়ে ফুটে উঠেছিল।

রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রথমে তিনি জনসঙ্ঘের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরে ভারতীয় জনতা পার্টি। ১৯৫৭ সালে তিনি সংসদ সদস্য হন। এরপর ১৯৭৭ সালে মোরারজী দেশাইয়ের মন্ত্রীসভায় তিনি ভারতের বিদেশমন্ত্রী হন। প্রথম তিনিই হিন্দিতে বক্তৃতা করেন রাষ্ট্র সঙ্ঘের সাধারণ সভায়। পরস্পর বিরোধী বহু রাজনৈতিক দলকে একত্র শামিল করে সরকার গঠন করেন।

কলকাতায় এলেই তিনি ঘনশ্যাম বেরিওয়ালজীর বাড়িতে ঘরের মানুষ, বন্ধু, অতি প্রিয়জন হিসেবেই থাকতেন। এতই মধুর সম্পর্ক ছিল যে ঘনশ্যামজীর স্ত্রী ছিলেন তাঁর বহিনজী। বেরিওয়ালা হাউস ছিল তাঁর নিজের বাড়ি। ঘনশ্যামজীর বাড়িতে আমারও কয়েকবার বৈঠক উপলক্ষ্যে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল।

১৯৯৬ সালে অটলজী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি চেয়েছিলেন জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্বকে এক বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে। সমস্ত ক্ষেত্রে, সমস্ত বাধা অতিক্রম করে মধ্যপ্রদেশের এই জননেতা আন্তর্জাতিক চোখরাঙানিকে ভয় না করে পোখরানে সফল পরমাণু পরীক্ষা করেন।

মানবতার অপর নাম সবাইকে ভালোবাসা। অটলজী একজন প্রকৃত দরদি মানুষ ছিলেন। তিনি জাত-পাত-ধর্ম ইত্যাদির ঊর্ধ্বে উঠে সবাইকে ভালো রেখেছেন। সেটা অতি সহজেই তাঁর মুখের হাসিতে ফুটে উঠত। তাঁর চোখ দুটো মায়া ও ভালোবাসায় ভরা ছিল। মানুষের মনে যেটুকু জায়গা তিনি অধিকার করেছেন, তা ভালোবাসা দিয়ে। তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে কোথাও ফারাক ছিল না। তাঁর প্রতিটি কাজই মানুষের ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে সফল হয়েছে। রাজনৈতিক মতাদর্শ যাই হোক না কেন, তাঁকে সবাই কাছের মানুষ হিসেবে দেখতেন। দেশের জন্য তিনি যা করেছেন দেশের মানুষ চিরকাল তা মনে রাখবে। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে তিনি ভারত পাকিস্তানের মধ্যে বাস সার্ভিস চালু করেছিলেন এবং নিজেই ওই বাসে পাকিস্তানে গিয়েছিলেন (লাহোর থেকে দিল্লি) ভারত পাকিস্তানের মধ্যে তাঁর এই যে সুসম্পর্কের প্রচেষ্টা, তার বিনিময়ে পুরস্কার হিসেবে পেয়েছিলেন 'কার্গিল যুদ্ধ'। হাসি মুখে তা বরণ করে তার উপযুক্ত জবাবও দিয়েছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের বুকে আমি 'মৌসিজী (লক্ষ্মীবাঈ) কেলকার-র আশীর্বাদ নিয়ে রাষ্ট্রসেবিকা সমিতিরকাজ শুরু করি। সেই সময়ের একটি ছোট্ট ঘটনা আমার মনকে গভীর ভাবে নাড়া দেয়। মহাজাতি সদনের মঞ্চে উপবিষ্ট অটলজী। অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল অটলজীর আশীর্বাদ নেবার। শ্যামমোহনদার সঙ্গে মঞ্চে গিয়ে পরিচয় দিয়ে প্রণাম করতেই তাঁর আশীর্বাণী— 'আরতি হিন্দি শিখ, আগে বাড়'। তারপর কয়েকবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। স্মৃতি হয়ে আছে তাঁর মুখে শিশুর মতো সরল হাসি।

তাঁর সুন্দর সুন্দর কবিতা আমি সর্বদাই স্মরণে রাখার চেষ্টা করি।

২০১৮ সালের ১৬ আগস্ট তিনি অমৃতলোকে যাত্রা করলেন। ভারতমাতা হারালেন তাঁর ত্যাগী ঋষি সন্তানকে। দেশ হারাল এক মহান যোদ্ধা, দেশনায়ককে। তিনি ছিলেন ভারতমাতার বীরপুত্র এবং একাধারে কবি, বাগ্মী ও সর্বজনমান্য নেতাকে। পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, ভারতমাতা যেন যুগে যুগে এই রকম কৃতী সন্তানকে ফিরে ফিরে পান। ■

রাহ কৌন সী যাউঁ ম্যাঁয় ?

প্রবাল চক্রবর্তী

বলুন তো, অটলবিহারী বাজপেয়ীজীর জীবন নিয়ে যদি একটা সিনেমা হয়, সে ছবির শেষটা কীরকম হবে? মিলনান্ত, নাকি বিয়োগান্ত? তার আগে বলুন, বাজপেয়ীজী যদি রাজনীতিক না হতেন, তাহলে কী হতেন? না, এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত, কোনো সন্দেহ নেই। তিনি ছিলেন স্বভাবকবি। কবিতাই ছিল তাঁর আত্মার অনুরণন, দেশের পরিস্থিতি বাধ্য করেছিল রাজনীতিতে যোগ দিতে। জানেন তো, কবি-সাহিত্যিকরা আর দশটা মানুষ থেকে একটু অন্যরকম। অতি সংবেদনশীল, ভাবুক। তাই দ্বিধা পিছু ছাড়ে না। চৌমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে আমি, কোনদিকে মোড় ঘুরব? কোন পথে আমি যাব? এ দ্বিধা বাজপেয়ীজীর জীবনেও বারবার এসেছে। একটি কবিতায় লিখেছিলেন—

রাহ কৌন সী যাউঁ ম্যাঁয়?

'চৌরাহে পর লুটতা চীর, প্যায়াদে সে পিট্ গয়া ওয়াজির,
চলুঁ আখিরী চাল কি বাজী, ছোড় বিরক্তি রচাউঁ ম্যাঁয়?
রাহ কৌন সী যাউঁ ম্যাঁয়?
সপ্না জন্মা অউর মর গয়া, মধু ঋতু মেঁ হী বাগ ঝর গয়া,
তিন্‌কে বিখরে হুয়ে বটোরুঁ য়া নব নীড় সজাউঁ ম্যাঁয়?
রাহ কৌন সী যাউঁ ম্যাঁয়?
দো দিন মিলে উধার মেঁ, জীবন কে ব্যাপার মেঁ,
ক্ষণ ক্ষণ কা হিসাব জোড়ুঁ য়া পূঞ্জি শেষ লুটাউঁ ম্যাঁয়?
রাহ কৌন সী যাউঁ ম্যাঁয়?'

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মৃত্যু ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক নির্ণায়ক মোড়। গণতন্ত্রের প্রহসন! এক ঝটকায় নিজেকে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন করে ফেললেন জওহরলাল নেহরু। পরে, একই কাজ করলেন জওহরতনয়া ইন্দিরাও। মুখার্জি ও শাস্ত্রী, দুটো মৃত্যুই খুব কাজ থেকে অনুধাবন করেছিলেন বাজপেয়ীজী। প্রাণের ভয় পাননি? মনে হয়নি, এ দেশের কিছু হবে না, এ গণতন্ত্রের কোনো ভবিষ্যৎ নেই? ভয় তাঁকে পথভ্রষ্ট করেনি, প্রমাণ তাঁর রাজনৈতিক জীবন।

ইন্দিরার কলমের খোঁচায় সেই ভঙ্গুর গণতন্ত্রও গেল জেলে। অন্য সব দেশনেতার সঙ্গে বাজপেয়ীজীও হলেন বন্দি, অনির্দিষ্টকালের জন্য। মুক্তির কোনো আশা ছিল না। বাজপেয়ীজী নিজেই বলেছিলেন, মাঝে মাঝে মনে হতো, এভাবে বেঁচে থেকে কী লাভ! মরে গেলেই তো ভালো হয়! লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতেন। লুকিয়ে, পাছে সতীর্থদের মনোবলে আঘাত লাগে। রাজনীতি ছেড়ে দিতে পারতেন সেদিন। বাকি জীবনটা কবিতা লিখে কাটিয়ে দিতেন। নিরাশার সেই গহ্বর থেকে উঠে এসে বিরোধীদের একজোট করা, গণ-আন্দোলনে স্বৈরাচারী শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা— যে কোনো সিনেমার গল্পকে হার মানাবে সে কাহিনি।

তবু, এত কষ্টের পর, আবারও স্বৈরাচার গেল জিতে। গণতন্ত্রের স্বপ্নকে চূর্ণ করে ইন্দিরা আবার সিংহাসনে বসলেন, জনগণের বিপুল ভোটে জিতে। জনসঙ্ঘ বিলুপ্ত, জনতা পার্টি ভেঙে চুরমার। লড়াই ছাড়েননি বাজপেয়ীজী। স্বৈরাচার জিতেছে একের পর এক নির্বাচনে। ইন্দিরা, তস্য পুত্র রাজীব। সংসদ থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তাঁর জন্মলালিত আদর্শবাদ, তবু লড়াই থামাননি। দেশের মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাননি।

'চৌরাস্তায় লুটোয় সম্ভ্রম, তস্কর আজ শাসকের যম।
শেষ রণে আহুতি দেব প্রাণ, নাকি বিরাগে ডুবে যাব?
কোন পথে আমি যাব?'

জয় শ্রীরাম! 'মহারব উঠে, বন্ধন টুটে, করে ভয় ভঞ্জন!'

রামমন্দির আন্দোলনের দামাল ঝড় আমার প্রজন্মের সঙ্গে বাজপেয়ীজীর পরিচয় করিয়ে দিল। জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য, তিন নয়তো তিন হাজার! তারপরের ঘটনাবলী তো অভূতপূর্ব এক নয়া ইতিহাস। জীবনের শেষ সম্বল উজাড় করে দুই থেকে দুইশত হবার ইতিহাস। নিউরোনের শেষ স্ফুলিঙ্গটাকে দাবানল করে বৈচারিক স্তরে স্বৈরাচারীদের কোণঠাসা করে ফেলার ইতিহাস। 'বিজলি-সড়ক- পানি', 'সুশাসন' শব্দবন্ধগুলোর সঙ্গে পরিচয়ের ইতিহাস। যেদেশে একই পিচের রাস্তা প্রতিবছর মেরামত (!) রাজনীতিকদের কাটমানি জোগাড়ের পদ্ধতি, সেদেশে দেশ জুড়ে আন্তর্জাতিক মানের হাইওয়ে তৈরি। সোনালি চতুর্ভুজ, সাগরমালা। পশ্চিমি বিশ্বের চোখরাঙানি উপেক্ষা করে 'গোল্ডিলক' ছেড়ে বেরিয়ে আসা। পরমাণু শক্তিধর হয়ে ওঠা। এতকিছু করার পরেও প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীজী তাঁর জীবনের শেষ নির্বাচনে হেরে গেলেন। জনগণকে আরও একবার ভুল বোঝাতে পেরেছিল অন্ধকারের শক্তি। তাঁরই তৈরি হাইওয়ে থেকে তাঁর নাম ছবি সব মুছে গেল। কিন্তু বাজপেয়ীজীর শেষ লড়াইয়ের ফলে ভারতের ইতিহাস সেদিন যে মোড় ঘুরেছিল, তার ফলে ভারতের রাজনীতি বদলে গেছে চিরতরে।

দেশভক্তির জীবনকাহিনি মিলনান্ত হয় না, বিয়োগান্তও হয় না। সে কখনোই অবিমিশ্র জয় বা পরাজয়ের আখ্যান নয়। সে হলো দ্বিধাকে অতিক্রম করে, ভয়কে জয় করে এগিয়ে চলার গাথা। এ এক কখনো-হার-না-মানা জীবনের গল্প। যতদিন শরীর চলে, যতদিন মস্তিষ্ক সঙ্গ দেয়, ততদিন লড়াই চলতেই থাকে। আমরা সে লড়াই দেখি না দেখি, মহাকাল তার হিসেব ঠিকই রাখেন। দেশমাতৃকার চরণে দেশভক্তের সেটাই পূর্ণাহুতি। রাষ্ট্রায় স্বাহা, ইদং রাষ্ট্রায় ইদং ন মম। ■

পরম্পরা

স্বস্তিক চিহ্নের তাৎপর্য বহু দূর পরিব্যাপ্ত

ড. সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়

কেবলমাত্র ভারতবর্ষীয় হিন্দুদের কাছেই নয়, ‘স্বস্তিক’ চিহ্নের তাৎপর্য ধর্মীয় ও ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূর পরিব্যাপ্ত। ‘স্বস্তিক’-কে কেউ কেউ রহস্যময় অতিন্দ্রিয় এক চিহ্ন বলে গণ্য করেছেন, যার সঙ্গে মিল রয়েছে ইউরোপের ‘ফিলফট’ বা ‘গাম্যাডিয়ন’ চিহ্নের সঙ্গে। এই চিহ্নগুলি ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জগুলি ছাড়াও এশিয়া মাইনর এমনকী আফ্রিকাতেও পাওয়া গেছে। খ্রিস্টাধর্মের নানা অনুষঙ্গে এই চিহ্নের ব্যবহার পাওয়া যাচ্ছে। জৈনরা তাদের আটটি শুভ বা ‘মঙ্গল’ চিহ্নের অন্যতম হিসেবে জ্ঞান করেছে স্বস্তিককে। বৌদ্ধদের কাছেও স্বস্তিক শুভ চিহ্ন হিসেবে গৃহীত হয়েছে। বুদ্ধের জন্মের পর তাঁর হাতের তালুতে যে সমস্ত শুভ চিহ্নগুলি দেখা গিয়েছিল তার অন্যতম ছিল স্বস্তিক।

ভারতবর্ষের স্বস্তিকার ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্ভবত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ঋক্ বেদের শ্লোকে যে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে স্বস্তিক যে সূর্যের সঙ্গে সম্পর্কিত এমনটি অনুমান করছেন পণ্ডিতরা। তাদের মতে, সূর্য উদিত হলে চারদিক আলোয় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। স্বস্তিকের চারটি বাহু সেই সূর্যালোকিত চতুর্দিকের প্রতীক। যদিও কানিংহামের মতে, স্বস্তিকের সঙ্গে সূর্যের কোনো যোগসূত্র নেই। তিনি মনে করেন, ব্রাহ্মী হরফে ‘সু’ আর ‘অস্তি’ দুটি হরফের যোগফল স্বস্তিক। অপর একটি মত হলো, ভগবান বিষ্ণুর চক্রের চারটি ‘স্পোক’ স্বস্তিকের মধ্যে প্রতীকায়িত। যাইহোক, বিভিন্ন পণ্ডিতদের আলোচনার মধ্য দিয়ে স্বস্তিকের আর যে সমস্ত প্রতীকী অর্থ উঠে এসেছে তা হলো— কোনো প্রাচীন দেবতার প্রতীক, প্রবাহিত জলধারা, স্ত্রী জননাঙ্গ, বজ্রপাত ইত্যাদির ইঙ্গিত বহন করছে স্বস্তিক।

ভারতীয় উপমহাদেশে স্বস্তিকের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে সিন্ধু সভ্যতায়। ভারতীয় সভ্যতার অন্যতম উৎসও সিন্ধু সভ্যতা। সিন্ধু সভ্যতার নানান কেন্দ্রে একক ভাবে একত্রিত অলংকরণ রূপে স্বস্তিক চিহ্ন মিলেছে। ম্যাককে বলছেন, যে মুখের অলংকার রূপে স্বস্তিক ব্যবহার করা হতো। কিন্তু অচিরেই, মহেঞ্জদাড়োতে পাওয়া একটি সীলমোহরে দেখা গেল স্বস্তিক চিহ্নের সামনে একটি হাতি প্রণাম নিবেদন করছে। এর থেকে বোঝা গেল যে স্বস্তিক আসলে কোনো অতিন্দ্রীয় বা অলৌকিক শক্তির আধার হিসেবে পরিগণিত হতো সিন্ধু সভ্যতার সময়েই।

প্রাক্ মৌর্য পাঞ্চমার্কড মুদ্রা স্বস্তিক চিহ্ন বহন করত। সম্রাট অশোকের মুদ্রাগুলি স্বস্তিক চিহ্নের সঙ্গে সঙ্গে বজ্র, হস্তী প্রভৃতি চিহ্ন দ্বারাও লাঞ্ছিত। আবার শ্রীলঙ্কায় প্রাপ্ত মুদ্রায় স্বস্তিক চিহ্নের সঙ্গে সঙ্গে গজলক্ষ্মীও খোদিত হয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন মুদ্রা ছাড়াও স্বস্তিক চিহ্ন অন্যান্য বস্তুর উপরও খোদিত থাকতে দেখা যেত। ভির থেকে মার্শাল একটি হাড়ের অংশ পেয়েছিলেন যেখানে তির, নন্দীপদ এবং স্বস্তিকা চিহ্ন যুগপৎ অবস্থান করছে দেখা যায়। তক্ষশীলায় পাওয়া একটি চতুষ্কোণ তামার সীলমোহরে খরোষ্ঠি লিপিতে উৎকীর্ণ অক্ষরের সঙ্গে স্বস্তিক চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। এই সমস্ত নিদর্শন ছাড়াও মৃৎপাত্র এবং গুহাগাত্রে স্বস্তিক চিহ্ন খোদিত রয়েছে দেখা যায়। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রানি গুম্ফা গুহাতে স্বস্তিক চিহ্নের উপস্থিতি লক্ষ্য করি।

সুপ্রাচীনকাল বলতে গেলে প্রাক্-ইতিহাস পর্ব থেকে স্বস্তিক চিহ্নের এই যে সুপরিব্যাপ্ত আন্তর্সাংস্কৃতিক উপস্থিতি তা এই চিহ্নটি অপরিসীম তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে। ম্যাক্সমূলার তাঁর বক্তব্যে ‘স্বস্তিক’ যে একান্ত রূপে ভারতীয় উৎসজাত এমন অভিমত প্রকাশ করলেও, স্বস্তিক স্থান-কাল-পাত্রের ভিন্নতায় নানা তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়েছে। উইলসন তাঁর গ্রন্থে (১৮৯৬) ‘স্বস্তিক’ আমাদের জানা সবচেয়ে প্রাচীন প্রতীক রূপে উল্লেখ করেছেন এবং এর স্থানান্তর গমনের ইতিবৃত্তান্ত শুনিয়েছেন। এই সমস্ত বিবরণ ও বিস্তার থেকে স্বস্তিকের ধর্মীয় এবং অলৌকিক বিভাটি বিশেষ ভাবে বিকশিত রয়েছে লক্ষ্য করা যায়। আলাচা হুরুক-এ ২৩০০-২১০০ খ্রিস্টপূর্ব যে হিট্টাইটদের কবর পাওয়া গেছে সেখানে জাফরির মতো বর্গক্ষেত্রে পরপর খোপে খোপে স্বস্তিক চিহ্ন সজ্জিত রয়েছে। এটিকে ধর্মীয় তাৎপর্য যুক্ত বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

বাঙ্গালি হিন্দু সংস্কারে বিবাহের সময় ঘরের দেওয়ালে যে ‘বসুধারা’ অঙ্কন করা হয়, তাও এক ধরনের স্বস্তিক চিহ্ন বা স্বস্তিক চিহ্নের পরিবর্তিত বা আঞ্চলিক রূপ। নান্দীমুখ বা নান্নীমুখ-এর সময় এই বসুধারা অঙ্কিত হয়— এখানে পূর্বপুরুষদের স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে বংশবৃদ্ধির কামনাও ব্যক্ত হয়। বসুধারায় যে সমস্ত উপাদান ও রং ব্যবহৃত হয় তা একই কৃষি, বংশবৃদ্ধি, সূর্য, পৃথিবী এবং জন্ম জন্মান্তরের যোগসূত্রকে প্রতীকায়িত করে। বাঙ্গালির এই সংস্কার স্বস্তিককে ঘিরে এর সর্বভারতীয় শুভদায়ক রূপটির সঙ্গে এভাবেই বাঁধা পড়ে যায়। ■

মা মুক্তকেশী কালী

ড. মনোরঞ্জন দাস

কালের প্রতীক কালী। মা দুর্গারই বিভিন্ন রূপের একটি। মা হলেন সর্বব্যাপিনী। মুক্তকেশী তার এক অনন্য অপরূপা রূপ এবং যেন অনুক্ষণ, তথা কাল বা সময়ের প্রতীক। মাতা তো মাতা-ই। মা মুক্তকেশী সাফল্য বা মুক্তিরও অনন্য ধারা। মা মুক্তকেশী সর্বময়ে আশ্রিত থেকে তার সন্তান ও ভক্তদের রক্ষা করেন, সাংসারিক সুখ প্রদান করেন, সমৃদ্ধি প্রদান করেন, শান্তিও প্রদান করে থাকেন সর্বদা। অঘ্রান মাসের অমাবস্যায় মা ভক্তমাঝে পূজিতা হন। বর্ধমান জেলার অম্বিকা কালনার সিমলন গ্রামের হেঁদোর পাড়ায় অর্থাৎ সিমলন-উত্তরপাড়ায় বিখ্যাত দাস পরিবারে প্রতি বছর জাঁকজমকে ও ভক্তিভরে মা পূজিতা হন। গ্রামের লোক নিষ্ঠাভরে পূজা করে থাকেন। অন্য পাড়া বা অন্য গ্রাম থেকেও লোকজনের সমাগম হয়।

দাস বংশের বর্তমান বয়োজ্যেষ্ঠ নারায়ণচন্দ্র দাসের কথায়—

প্রায় পাঁচশত বছর আগে, একদিন অঘ্রানী অমাবস্যার দিনে বাঞ্ছারাম অম্বিকা কালনা থেকে আটঘড়া হয়ে কাটাপুকুরের পাশে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সিমলন গ্রামে নিজের বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ি ফিরতে তার বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ঠিক সেই সময়ে বাঞ্ছারাম দেখতে পেলেন তিন কিশোরী আলুথালু বেশে ওই কাটাপুকুরের পাশে জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করছে। বাঞ্ছারাম তিন কন্যাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা এখানে কী করছ, মায়েরা? তিনকন্যা সমস্বরে উত্তর দিল, 'আমরা গাঁয়ে ফিরব। পথ হারিয়ে ফেলেছি।' বাঞ্ছারাম বললেন, 'এসো মায়েরা আমার সঙ্গে। আমি তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দেব। তোমাদের বাড়ি কোন দিকে?' তিনকন্যা বলল, 'তুমি যে দিকে যাচ্ছ, সে দিকেই আমাদের বাড়ি।'

অগত্যা ওই তিন কন্যা ও বাঞ্ছরাম দত্ত সিমলনের পথে পা বাড়াল। মাঠ পেরিয়ে চারজন সিমলনের হেঁদোর পাড়ায় পৌঁছুতেই প্রথম কন্যা বলল, 'আমি আর যেতে পারছি না। আমার পা ব্যথা করছে।' বলেই সে হেঁদোর পাড়ার দাস বংশের এক পোড়ো বাড়ির বাড়ির বারান্দায় বসে পড়ল। এখানে মুক্তকেশী মায়ের আজও পুজো হয়ে চলেছে। অঘ্রানী অমাবস্যায় প্রতি বছর এখানে নিষ্ঠা সহকারে মা পূজিতা হন। ওইদিন রাতেই বাঞ্ছারাম স্বপ্ন দেখেন— মা বলছেন, 'আমি মা মুক্তকেশী কালী। প্রতি বছর অঘ্রান অমাবস্যায় তুই আমাকে হেঁদোর পাড়ায় যেখানে বসেছি, সেখানে মুক্তকেশী নামে পুজো করবি।' সেই খেকে বাঞ্ছারাম দত্ত দাস বংশের ভিটেয় পুজো শুরু করে।

কালক্রমে বাঞ্ছারাম দত্তের মৃত্যু হলে বাঞ্ছারামের গোত্র পরিবর্তিত হয়ে, দাস বংশের নামে কাশ্যপ গোত্রে পূজিতা হতে থাকেন মা মুক্তকেশী। বর্তমানে জীবিত নারায়ণ চন্দ্র দাসের পূর্বপুরুষ রামদাস দাস, দীননাথ দাস, হরিহর দাস, রাজচন্দ্র দাস এবং তার পূর্বপুরুষগণ মা মুক্তকেশীর পুজো করে চলেছেন। বর্তমানে রামদাস দাসের দুই পুত্র— নারায়ণ চন্দ্র দাস এবং তার বংশধরগণ এক বছর এবং মৃত তিনকড়ি দাসের বংশধরগণ পরের বছর মায়ের পূজা করে থাকেন। এটাই ক্রমাগত ধারা।

তিন কন্যার মধ্যে দ্বিতীয় কন্যা সিমলনের মধ্য পাড়ায় চলে যান। সেখানে ওই কন্যা দক্ষিণা কালিকা বা এলোকেশী নামে পূজিতা হন, কার্তিক মাসের অমাবস্যায় ওখানকার দত্ত বংশের দ্বারা। এখনো মা এলোকেশী দত্তবংশে পূজা পেয়ে চলেছেন।

তৃতীয় কন্যা চলে যান পশ্চিম পাড়ায়। মা সেখানে রক্ষাকালী নামে প্রতি ফাল্গুন মাসের অমাবস্যাতে ভক্তিভরে পূজিতা হন।

হেঁদোর পাড়ায় দাস বংশে মা মুক্তকেশী শ্যামারূপে পূজিতা হন। শ্যামা অর্থাৎ শস্যশ্যামলা তথা সুন্দরের প্রতীক।

পূজার আগের দিন বা পুজোর দিন মায়ের মূর্তি আনা হয়। অথবা মূর্তি কুমোর দিয়ে বানানো হয় বাড়িতেই। অমাবস্যার রাতে বারোটা থেকে পূজা শুরু হয়। তার আগে গ্রামের বড়ো পুকুর থেকে জল এনে ঘট বসানো হয়, মা মুক্তকেশীর মূর্তির সামনে। তারপর পূজারি অত্যন্ত শুদ্ধভাবে, ভক্তিভরে পূজারম্ভ করেন।

মুক্তকেশী মায়ের পূজায় পাঁঠা বলি হয়। ওই পাঁঠার মাংস প্রসাদ হিসাবে খাওয়া হয়। সকাল হলে প্রথম পর্বের পুজো শেষ হয়।

দ্বিতীয় পর্বের পূজা শুরু হয় পরদিন দুপুর বেলা। আরও এক প্রস্থ পূজা চলে এবং পূজা শেষ হয় বেলা দুটোয়। পূজা চলাকালীন পূজারি উচ্চারণ করেন—

'কলনাং সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ।

মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা।।

কালসংগ্রহনাং কালী সর্বেষামানি রূপিনী।

কালত্বদাদি ভূতত্বদাদ্যা কালীতে গীয়সে।। ■

ভারতীয় চিত্রশিল্পের জীবন্ত ঐতিহ্য রাজা রবি বর্মা

কৌশিক রায়

পুরাণ কাহিনি বা লোককথাকে উপজীব্য করে, দেশীয় ঐতিহ্যকে মেনে নিয়ে অবিস্মরণীয় চিত্রকলা রচনা করেছেন বিশ্বের অনেক খ্যাতনামা চিত্রকরই। রোমান পুরাণে কথিত, সৌন্দর্যের দেবী ভেনাসের জন্ম নিয়ে একটি অসাধারণ তৈলচিত্র এঁকেছিলেন ইতালীয় চিত্রশিল্পী সান্দ্রো বত্তিচেল্লি। স্পেনের শিল্পী ফ্যান্সেসকো গোইয়া এঁকেছিলেন দেবতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা দৈত্য বা 'টাইটান' জাতির অন্যতম বীর-'কোলোসাস'-কে। আচার্য নন্দলাল বসুর আঁকা ছবি— 'শিবের বিষ পান' বাঙ্গলার চিত্রশিল্পে একটি বিশেষ স্থান দখল করে রেখেছে। তবে, ভারতীয় চিত্রশিল্পের ঐতিহ্যকে পুরাণ, মহাকাব্য, সংস্কৃতি এবং চিরায়ত সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে বাঙ্ময় করে রেখে গেলেন যে নিরভিমানী শিল্পী— তাঁর কথা কখনোই ভোলা যাবে না। ঊনবিংশ শতকে কেরলের ত্রিবাংকুর রাজ্যে (বর্তমানে রাজধানী শহর তিরুবনন্তপুরম) জাত সেই অনালোচিত কিন্তু অধ্যবসায়ী শিল্পী নাম রাজা রবি বর্মা।

ভারতীয় মহাকাব্য, পুরাণ সমগ্র এবং চিরায়ত সাহিত্যে ও ইতিহাসে বেঁচে থাকা রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, নল-দময়ন্তী, শকুন্তলা, সীতা, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, দ্রোণাচার্য, গান্ধারী, কচ, দেবযানী, দধীচির মতো চরিত্রগুলি সবসময়েই তাঁদের নিষ্ঠা, সদাশয়তা, শৌর্য, তিতিক্ষা, করুণার মতো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে সাধারণ মানবসমাজের জীবনশৈলীকে প্রভাবিত করে চলেছে। এই চরিত্রগুলির স্বভাবমাধুর্য যাতে সাধারণ মানুষের জীবনস্রোতে দিগ্‌নির্দেশিকার মতো কাজ করতে পারে, তার জন্যই হাতে রং-তুলি তুলে নিয়েছিলেন ঋষিতুল্য প্রজ্ঞার অধিকারী এবং সরল জীবনচর্যাতে আমৃত্যু বিশ্বাসী রাজা রবি বর্মা। তাঁর চিত্রকলার প্রতি অকুণ্ঠ প্রশংসা জানিয়ে কবিতা লিখেছিলেন স্বদেশপ্রেমিক তামিল কবি সুব্রহ্মনীয়া ভারতী।

রাজা রবি বর্মার আঁকা ছবিগুলির মধ্যে অবশ্যই অন্যতম হয়ে আছে রাজা নল-এর সাধ্বী ভার্যা দময়ন্তীর ছবিটি। এই তৈলচিত্রে ভারতীয় নারীত্বের স্থৈর্য, পতিনিষ্ঠা এবং সতীত্বের প্রতীক দময়ন্তী একটি রাজহাঁসকে তাঁর ভালোবাসা ও বিরহের সংবাদ রাজা নলকে প্রেরণ করতে অনুরোধ করছেন। রাজা চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় নবরত্ন পণ্ডিতবর্গের অন্যতম কবি ও নাট্যাচার্য কালিদাস লিখেছিলেন 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকটি। মৃগয়া করতে শকুন্তলার পালক পিতা ঋষি কণ্বের তপোবন আশ্রমে পদার্পণ করেন সুপুরুষ নৃপতি দুষ্মন্ত। তাঁকে দেখে প্রেমমোহিতা হন শকুন্তলা। প্রণয়াসক্ত ঋষিদুহিতার পায়ে কাঁটাবিদ্ধ অবস্থায় রাজা দুষ্মন্তকে দেখার আকুল চিত্রটি রাজা রবি বর্মা ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর তৈলচিত্রে। আবার, জটায়ুর পক্ষচ্ছেদ নামক ছবিটিতে রাজা রবি বর্মা দেখিয়েছিলেন— পেশিবহুল শরীরের অধিকারী, কালান্তক দুরাত্মা, জানকী হরণকারী লঙ্কেশ্বর রাবণের তরবারির আঘাতে নিদারুণভাবে আহত রাম-অনুচর জটায়ু পক্ষীকে। রাজা রবিবর্মার একটি তৈলচিত্রে দেখানো হয়েছিল কেরলের মালাবার উপকূল নিবাসী, বাদ্যযন্ত্র হাতে এক সাধারণ, সুশীলা গৃহবধূকে। এই ছবিটি তদানীন্তন ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেলের স্বর্ণপদক লাভ করে। অর্জন করে ত্রিবাংকুরের মহারাজার আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা। বীর শৃঙ্খলা বা মোটা সেনারা বালা, মহারাজার তরফ থেকে উপহার দেওয়া হয় রাজা রবি বর্মাকে। কেরলের নাইয়ার জনগোষ্ঠীর জীবনচর্যা নিয়ে রাজা রবি বর্মার আঁকা ছবি মাদ্রাজ চিত্র প্রদর্শনীতে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছিল। বরোদার মহারাজার দেওয়ান স্যার মাধব রাওয়ের অনুরোধে ভারতীয় পুরাণকাহিনিকে উপজীব্য করে ১৪টি তৈলচিত্রের একটি সিরিজ আঁকেন রাজা রবি বর্মা। তাঁর আঁকা মানবচিত্রগুলির মধ্যে ভারতীয় ছাড়াও গ্রিক ও রোমান প্রভাব স্পষ্ট।

ত্রিবাঙ্কুরের অভিজাত পরিবারে জন্মানো রাজা রবি বর্মার চিত্রশিল্পে হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর কাকার কাছে। তাঁর কাছে পেনসিল স্কেচ আর জল রং করার কাজ শেখেন কিশোর রবি বর্মা। প্রথমদিকে রং হিসেবে সাধারণ কাঠ কয়লা, রঙিন পাথর, কলিচুন, পলাশফুলের রস ব্যবহার করতেন রাজা রবি বর্মা। ইউরোপীয় পেইন্ট ব্রাশও তাঁর ছিল না। স্টুডিও বলতে ছিল সাধারণ একটি ঘর। তাঁকে তৈলচিত্র আঁকতে উৎসাহ দিয়েছিলেন প্রখ্যাত ইংরেজ চিত্রকর থিওডোর জনসন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরে প্রাদেশিক পোশাকআশাক সম্পর্কে যে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছিলেন রাজা রবি বর্মা সেটি তিনি প্রয়োগ করেন তাঁর চিত্রকলাতে। কেরলের শাড়ির ঐতিহ্য রাজা রবি বর্মাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

রাজা রবি বর্মা উপাসনা করতেন মহীশূর রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মুকাম্বিকার। রাজা রবি বর্মা যখন শেষ শয্যায়, তখন তাঁর পুত্র রাম বর্মা, তাঁর বিশেষ নির্দেশ অনুযায়ী দেবী মুকাম্বিকার একটি ছবি এঁকেছিলেন। বর্তমানে তিরুবনন্তপুরম চিত্র প্রদর্শনশালা, জগন মোহন প্যালেস ও বরোদা প্যালেস পিকচার গ্যালারিতে রাজা রবি বর্মার আঁকা অনেক ছবি সংরক্ষিত আছে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

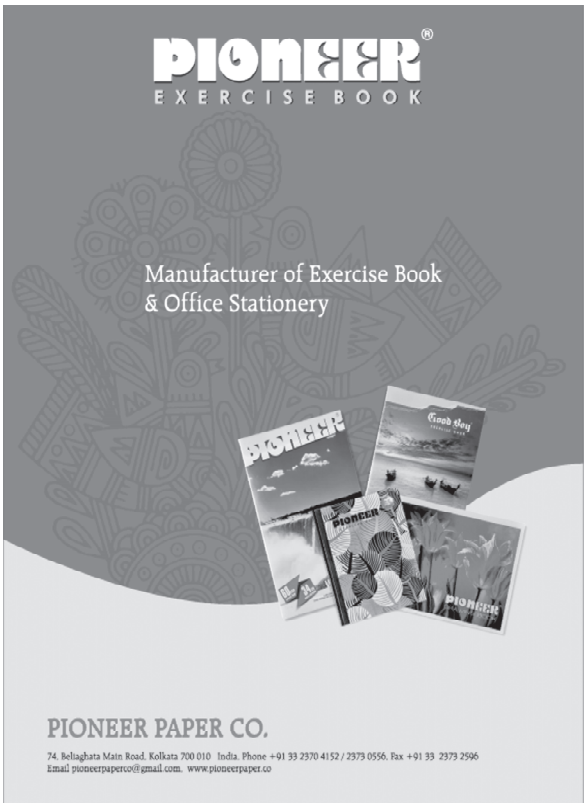

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

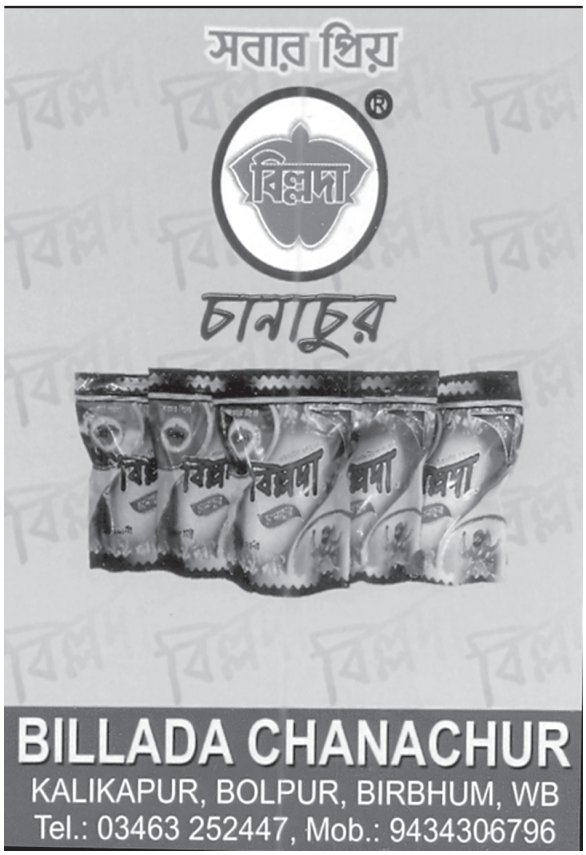

বজ্রাদপি কঠোরানি হওয়ার কথা বলা আছে ভারতীয় দর্শনে

কে. এন. মণ্ডল

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলটি লোকসভা ও রাজ্যসভায় বিপুল গরিষ্ঠতায় পাশ হওয়ার পরে ভারতের রাষ্ট্রপতির অনুমোদনে আইনে রূপায়িত। এই আইনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ব্যক্তিরা, রাজনৈতিক দলগুলি থেকে সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা এবং কয়েকটি মৌলবাদী ইসলামি সংগঠন এই আইনটি বাতিলের দাবিতে হিংসাশ্রয়ী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছে। রেললাইন উপড়ে ফেলার চেষ্টা, ট্রেন অবরোধ, ট্রেনে, বাসে অগ্নিসংযোগ, সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তি ধ্বংস, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ দেশজুড়ে অচল অবস্থার সৃষ্টি করেছে—যা দেশের সংহতি, নিরাপত্তা এবং ভাবমূর্তি নষ্ট করতে যথেষ্ট। তাই এই ব্যতিক্রমী সংগঠিত হিংসার কারণ অনুসন্ধান জরুরি।

বিরোধীদের দাবি, এই আইনটি দেশ বিরোধী, সংবিধান বিরোধী এবং সংখ্যার জোরে মোদী-অমিত শাহ আইনটি পাশ করেছেন। এদের এই বালখিল্য দাবি সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে হেয় করার জন্য। তবুও দেশের ১৩০ কোটি মানুষের ভোটে নির্বাচিত কেন্দ্রে একটি বলিষ্ঠ সরকার মানুষের ভরসার স্থল। উপাধি উপঢৌকন দিয়ে দলীয় বুদ্ধিজীবীদের মাঠে নামিয়ে বিরোধিতা সাধারণ মানুষ অবজ্ঞা করবেন এবং অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে কোনো আইন বা বিধি সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরেই পাশ হয়, এটা জেনেও যারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এর ভুল ব্যাখ্যা করছেন, তাদের উদ্দেশ্যের পিছনে গভীর চক্রান্ত এবং ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি কাজ করছে। প্রসঙ্গত, এই আইনটির প্রেক্ষিত তৈরি হয় ২০১৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর। কেন্দ্রীয় সরকার এক গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতে আশ্রয় নেওয়া হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখ, জৈন এবং পারসি জনগোষ্ঠীর উদ্বাস্তুদের ১৯২০ সালের ভারতীয় পাসপোর্ট আইন এবং ১৯৪৬ সালের বিদেশি নাগরিক শনাক্তকরণ আইনের ধারা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো এবং ওই সমস্ত মানুষ ভারতে বসবাস করতে পারবেন। পরবর্তী পদক্ষেপ, নাগরিকত্ব প্রদান সংক্রান্ত বিলটি আনা হয় ২০১৬ সালে এবং বিরোধীদের আপত্তিতে বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয়। ২ বছর সময় ধরে বিচার বিবেচনার পর ২০১৮/১৯ বিলটি সংসদে ফিরে আসে—লোকসভায় পাশ হয় কিন্তু রাজ্যসভায় পেশ হয়নি। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির দলীয় ইস্তাহারে উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতি ছিল, যা সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হওয়ার পরে আইনে পরিণত হয়েছে। সুতরাং এর মধ্যে বিরোধীরা অসাংবিধানিক এবং গায়ের জোরের কী উপাদান পেলেন। আর একশ্রেণীর বিদেশি সাহায্যপুষ্ট জাতীয়তা বিরোধী সংবাদমাধ্যম তাদের সম্পাদকীয় কলামে জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে কুৎসা, ইঙ্গিতপূর্ণ সংবাদ পরিবেশন, কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত একটি জাতীয় সরকারের বক্তব্যের প্রচার ব্ল্যাক আউট বা ভিতরের পাতায় পরিবেশন করে সাংবিধানিক অচলাবস্থা সৃষ্টিকারী শক্তির হয়ে মাঠে নেমেছে।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলটি সংসদে আলোচনার তাজা সম্প্রচার করেছে বিভিন্ন টিভি চ্যানেল। তাতে উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দানের বিরোধী শক্তির বাস্তব চেহারাটি সামনে এসেছে। ৩ বছর ধরে (২০১৬ থেকে) বিলটি বিচার বিবেচনার পরেও আবার বিলটিকে তৃণমূল এবং কংগ্রেসের এমপিরা সিলেক্ট কমিটিতে পাঠিয়ে আরও কালক্ষেপের পক্ষে ছিল। যাতে ২০২১-এর বিধানসভা ভোটের আগে বিলটি আইনে পরিণত না হয়, তৃণমূল নেত্রীর অসহিষ্ণু আচরণেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভারতের নাগরিকত্ব আইনটি প্রণীত হয় ১৯৫৫ সালে। সেখানে দ্বিজাতিতত্ত্বের

ভিত্তিতে দেশভাগজনিত কারণে ভারতের বাইরে আটকে পড়া অবিভক্ত ভারতের মানুষদের ভারতে নাগরিকত্ব দানের সহজ শর্তের সংস্থান ছিল। ভারতে মাত্র ছয় মাস স্থায়ীভাবে বসবাসকারী পূর্বতন ব্রিটিশ ভারতীয়দের বংশধরদের ভারতে নাগরিকত্ব প্রদানের সংস্থান ছিল এবং আইনটি ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত (পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা) চালু ছিল, যদিও ওই আইনে কেবলমাত্র সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব দানের উল্লেখ ছিল না। কারণ সেই সময় অভারতীয় মুসলমানদের ভারতে নাগরিক হওয়ার বিষয়টি একেবারেই অবান্তর ছিল (কিছু ব্যতিক্রম চাড়া)। কারণ তারা তাদের ধর্ম-তমুদ্দিন রক্ষার জন্য পাকিস্তান আদায় করে নিয়েছে। পরবর্তী পরিস্থিতিতে নানা কারণে ভারতে মুসলমান অনুপ্রবেশের ফলে সীমান্ত রাজ্যগুলিতে জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। ভবিষ্যতে খণ্ডিত ভারতের অখণ্ডতা প্রশ্নের সামনে এলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সুতরাং অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের নাগরিকত্ব প্রদান ভারতের স্বার্থবিরোধী। তার মানে এই নয় যে ভারতীয় মুসলমানরা সমান অধিকার ভোগ করবেন না। ভারতের সর্বোচ্চ পদের অধিকারী হওয়ার বাধা নেই কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। মুসলমান গোষ্ঠীর মানুষরা রাষ্ট্রপতি/প্রধানমন্ত্রীর পদও অলংকৃত করেছেন বারবার। কোনো বৈষম্য ভারতের সংবিধান বা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নেই। তবে তার মানে এই নয় যে, দেশভাগের বলি পাকিস্তান/বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব দানের সিদ্ধান্ত নিলে সংবিধানের অবমাননা হবে। বরং নেহরুদের দ্বিজাতিতত্ত্ব মেনে দেশভাগজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে মোদী সরকার। যে দাবি পূরণের জন্য বিভিন্ন উদ্বাস্তু সংগঠন যুগ যুগ ধরে লড়াই করছে–এমনকী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ এধরনের বিশেষ বিধি প্রণয়নের সুপারিশ করেছিলেন।

এদিকে ইসলামিক বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জমান কামাল বর্তমান নাগরিক সংশোধনী আইনটি ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র ক্ষতিগ্রস্ত করছে বলে অমূলক আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। বরং তিনি বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধানে মনযোগী হলে ভবিষ্যতে ভারতে শরণার্থী আগমন বন্ধ হতে পারে। এ বিষয়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ড. আবুল বারকাত সাহেবের জনসংখ্যা বিষয়ক গবেষণা পত্রে চোখ রাখলে জানতে পারবেন 'প্রতিদিন ৭৫০ জন এবং বছরে ২ লক্ষ ৫০ হাজার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বাংলাদেশ থেকে হারিয়ে যাচ্ছেন'—নিশ্চয়ই তারা পাকিস্তানে যাচ্ছেন না? বারকাত সাহেব যা উল্লেখ করেননি তা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষকে ভারতে রপ্তানি করে বাংলাদেশ জনবিস্ফোরণের ভারসাম্য রক্ষা করছে। আর এরাই হচ্ছে তৃণমূল, কংগ্রেস এবং বামপন্থীদের মূলধন। এদের কাজে লাগিয়েই ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রচেষ্টা। এ বিষয়ে নতুন সংযোজন হচ্ছে রোহিঙ্গা মুসলমানেরা। ১৮ মার্চ ২০১৮-এ মেহবুব কাদের চৌধুরীর আনন্দবাজারের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বারুইপুরের হাড়দহ এবং উত্তর ২৪ পরগনার সরবেড়িয়ায় তৃণমূলের মুসলমান নেতারা স্থানীয় এমপি এবং স্বয়ং তৃণমূল নেত্রীর প্রশ্রয়ে রোহিঙ্গাদের জন্য আশ্রয় শিবির করে কয়েকশো রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয়। শোনা যায় গত পঞ্চায়েত ভোটে এরা কার্যকরী ভূমিকা নিয়ে তাদের উপযোগিতা প্রমাণ করেছে।

গত লোকসভা ভোটে উত্তরবঙ্গের ৮টি সিট এবং দক্ষিণবঙ্গে ১০টি সিট হারিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো দিশেহারা। তাই তাঁর পক্ষে খড়কুটো আঁকড়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। কেন্দ্রীয় পদক্ষেপ হতে পারে তা জানা সত্ত্বেও উনি অসংবিধানিক সব রাস্তা নিচ্ছেন মুসলমান ভোট ১০০ শতাংশ নিজের দিকে টানতে। তা সম্ভব হলে, ২০২১ এর বিধানসভা ভোটে টিকেও যেতে পারেন। তবে সংশোধিত নাগরিক আইনের আওতায় আসা কোটি কোটি উদ্বাস্তু যদি তৃণমূলকে শাস্তি দেয় নাগরিক আইনের বিরোধিতার জন্য তাহলে তৃণমূলের ভরাডুবি নিশ্চিত। ভবিষ্যৎই এর উত্তর দেবে। কিন্তু তৃণমূলের ভাষায় নাগরিক বিলকে আক্রমণকারী

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন

আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর

3 in 1 Account

(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Find us on Facebook
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
E-mail : drsinvestment@gmail.com

কংগ্রেস এবং বামপন্থীরা কিন্তু মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখতে পারবে না এবং ২০২১-এ তাদের পশ্চাদগমনও এড়াতে পারবে না। নাগরিক বিলকে সমর্থন করেও এঁরা ভারতীয় মুসলমানদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় তার গ্যারান্টি দাবি করতে পারতো কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। তা না করে বিরোধীরা যা করছেন তাতে পশ্চিমবঙ্গে যে তারা জনবিচ্ছিন্ন হবেনই তা হলফ করে বলা যায়। উত্তরপূর্ব রাজ্য ছাড়া ভারতের সর্বত্রই নাগরিক বিলের সুবিধা পাবে এনডিএ সরকার। উত্তর-পূর্বের ভূপ্রকৃতি, জনবিন্যাসের চরিত্র আলাদা এবং রাজীব গান্ধীর অসম চুক্তি বর্তমান নাগরিক বিলের বিরোধী। তাছাড়া বাংলাদেশি মুসলমানরা সহজেই উপজাতি/জনজাতি মানুষের সঙ্গে বিবাহবন্ধন এবং অন্যান্য সম্পর্কে জড়িয়ে ভূমিপুত্রের দাবি জানাচ্ছে। যা হিন্দু বাঙ্গালিদের ধর্মীয় স্বকীয়তার জন্য সম্ভব হয়নি। ওই মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা যেমন উত্তর পূর্বের জনজীবনে মিশে গেছে তেমনি বাংলাদেশে তাদের বাড়িঘর, বিবি-বাচ্চারা রয়েছে। ভারতে আসা মুসলমানাদের অনুপ্রবেশকারীদের এ কারণেই বলা হচ্ছে যে তারা উদ্বাস্তু নয়। জাতিসঙ্ঘের UNHCR (United Nations' High Commission for refugees) 1967 সালের প্রোটোকল অনুযায়ী 'তিনিই উদ্বাস্তু যিনি ধর্মীয় ও জাতিগত কারণে অত্যাচারিত বা অত্যাচারের ভয়ে দেশত্যাগ করে অন্য দেশের আশ্রয়প্রার্থী এবং স্বদেশে ফিরে যেতে চান না।' যারা অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের হয়ে গলা ফাটাচ্ছেন তারা বলুন তো বাংলাদেশি মুসলমানরা কি জাতিগত বৈষম্য বা ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে ভারতে ঢুকেছেন না অন্য কারণে? এভাবে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ভারত রাষ্ট্রের চরিত্র বা জনবিন্যাসে পরিবর্তন এনে যাঁরা আর একটি পাকিস্তানের বা দারুল ইসলামের স্বপ্ন দেখছেন তাঁরা এখনই সাবধান হয়ে যান। ১৯৪৭ এবং ২০১৯ এর মধ্যে গঙ্গা-ভাগীরথী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। প্রখ্যাত ইহুদি শিল্পী মেনুহীন

সহিষ্ণুতার ধারক ভারতবর্ষ অন্যায়ের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন করে না—সেখানে 'বজ্রাদপি কঠোরানি' হওয়ার কথাও বলা আছে ভারতীয় দর্শনে।

বলেছেন, 'একজন সাধারণ পাশ্চাত্য ব্যক্তি থেকে একজন হিন্দু শতগুণ পরিচ্ছন্ন, অধিক সুসংস্কৃত, অধিক বিশ্বাসযোগ্য, অধিক ধার্মিক এবং সমতাপূর্ণ।' তাই বলে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে আর তো পিছানো যায় না। নিজের ধর্ম, সংস্কৃতি এবং অস্তিত্ব রক্ষায় তাদের জেগে উঠতে হয়। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী স্মরণীয়, 'হিন্দুত্বের মধ্যে ভারতের জীবনীশক্তি বিদ্যমান এবং যতদিন পর্যন্ত হিন্দুজাতি নিজের পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকার বিস্মৃত হবে না, ততদিন বিশ্বের কোনো শক্তি তাকে ধ্বংস করতে পারবে না।' তাইতো আটশো বছরের ইসলামি শাসন এবং দুশো বছরের ব্রিটিশের গোলামির পরেও ভারতীয়দের পুনরুত্থান ঘটেছে।

নাগরিকত্ব আইন মৃতদেহের উপর দিয়ে কার্যকরী করতে হবে বলে যাঁরা আস্ফালন করছেন, তাঁরা দেশভাগ পর্বে মহাত্মা গান্ধী এবং সাম্প্রতিককালে ৩৭০ ধারা বিরোধী কাশ্মীরের নেতা ফারুক আব্দুল্লাহর প্রতিশ্রুতির কথা মনে করলে ভালো করবেন। এঁরাও তাঁদের মতো বহাল তবিয়তেই থাকবেন, কারণ কেন্দ্রীয় আইন অবজ্ঞা করে যতই বৃত্তিভোগী এবং দলীয় ক্যাডারদের হাততালি মিলুক, সময়কালে ওই আইন মেনে না চললে টেলিভিশনে মুখ দেখানোর সুযোগ কমে যাবে। ভোটব্যাঙ্ক রক্ষার স্বার্থে অনুপ্রবেশকারীদের তাতিয়ে দিয়ে উত্তেজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যায়, কিন্তু কোটি কোটি উদ্বাস্তুদের নাগরিক অধিকার বঞ্চিত করার যে কোনো প্রচেষ্টা উদ্বাস্তুরা মাঠে নেমে প্রতিহত করবেন এ বিশ্বাস বহুদিন ধরে উদ্বাস্তু আন্দোলনে যুক্ত এ প্রতিবেদকের আছে। একটা ব্যাপার খুবই পরিষ্কার, এই নাগরিকত্ব আইনটি শুধুমাত্র উদ্বাস্তুদের নাগরিক পরিচয় পাইয়ে দিয়ে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজে পুনর্বাসিত করার জন্য, কোনো ভারতীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়। তা সত্ত্বেও ভারতব্যাপী যে ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে তা কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টিপর্বের ইতিহাসকেই মনে করিয়ে দিচ্ছে। আপনারা হঠাৎ যারা 'গান্ধীওয়ালি আজাদি'তে বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন তা আন্তরিক হলে খুবই ভালো। তবে আপনাদের অনেকের পূর্বপুরুষরা মুসলিম লিগকে ভোট না দিলে দেশভাগ হতো না এবং নতুন করে নাগরিকত্ব আইনও পাশ করতে হতো না। মনে রাখবেন, গত ৫ হাজার বছরের ইতিহাসে হিন্দুরা কোনো দেশ জয় করে ঔপনিবেশ তৈরি করেনি। ভিন্নমত, ধর্ম এবং সংস্কৃতিকে প্রশ্রয় দিয়েছে -- ধ্বংস করেনি। কারণ ভারতীয়রা ঐতিহ্যগতভাবে সহিষ্ণু।

পরিশেষে একথা বলা যায়, ভারত একটি সাম্য, সহিষ্ণুতা, নানা জাতি ধর্মের বিশাল দেশ। সকলেরই অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত। উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব প্রদানের আইন সংবিধানের মূল নীতির পরিপন্থী নয়। এমনকী ইন্দিরা গান্ধীর দ্বারা ১৯৭৬ সালে সংবিধানে যুক্ত 'ধর্ম নিরপেক্ষতা'র বিরোধীও নয়। এই আইনের বিরোধিতা, সংবিধানের বিরোধিতারই নামান্তর। ভারতবর্ষকে নতুন করে ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রমাণ দিতে হবে না, কারণ ভারত ঐতিহ্যগত ভাবেই সেকুলার এবং সকলের মঙ্গল কামনাই ভারতের দর্শন। অর্থাৎ 'সর্বে ভবন্তু সুখীনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।' তবে সহিষ্ণুতার ধারক ভারতবর্ষ অন্যায়ের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন করে না---সেখানে 'বজ্রাদপি কঠোরানি' হওয়ার কথাও বলা আছে ভারতীয় দর্শনে।

(লেখক স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার প্রাক্তন আধিকরিক)

ভারতের বিদেশ নীতির বুনিয়াদ এখন দৃঢ়

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

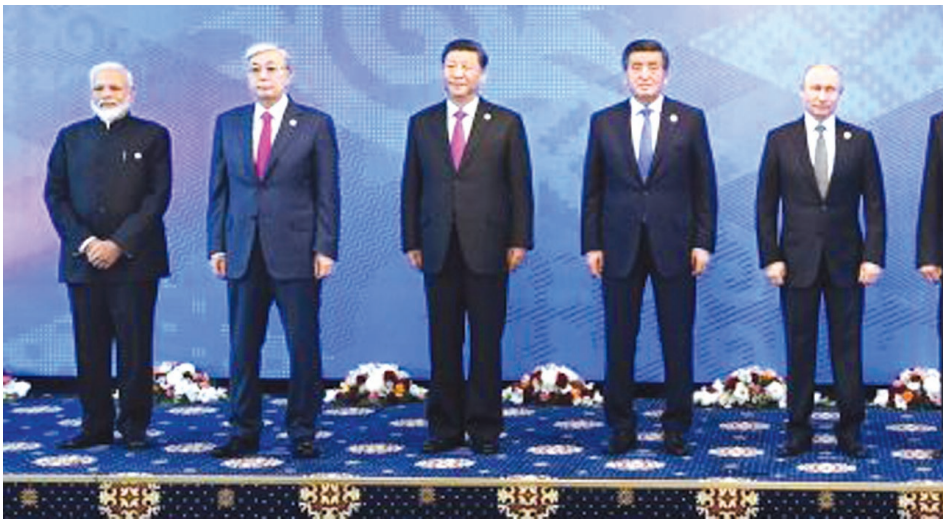

ভারতের পররাষ্ট্র নীতি নেহরুর সময় থেকে যে পথে এগিয়েছে এক কথায় বলতে গেলে তা আত্মসমর্পণের। উদাহরণ স্বরূপ শুধু কয়েকটা বলব। ১৯৪৭ সালে নেপালের প্রধানমন্ত্রী ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য তাঁর দেশের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু নেহরু তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অন্যদিকে নেহরু মণিপুরের ২২৩২৭ বর্গকিমি আয়তনের কাবো উপত্যকা, কাশ্মীরের মতো আর এক ভূস্বর্গ, বার্মাকে উপহার দিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে বালুচিস্তানের রাজা আহমেদ বালোচের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পরেও নেহরু বালুচিস্তান নিতে অস্বীকার করেন। পরে জিন্নাহ ১৯৪৮ সালে ২৭ মার্চ বালুচিস্তান আক্রমণ করে বলপূর্বক তা দখল করেন। ১৯৫০ সালে ওমানের সুলতান সায়েদ বিন তৈমুর গওদর বন্দর ভারতকে উপহার হিসেবে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু নেহরু তা নিতে অস্বীকার করলেন। পরে সুলতান তা পাকিস্তানকে বিক্রি করলেন। এখন চীন এই বন্দরকে কাজে লাগিয়ে পারস্য উপসাগর, এডেন উপসাগর, মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতীয় নৌবাহিনীর উপর নজরদারি চালাচ্ছে। ১৯৫০ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্থায়ী সদস্যপদ দিতে চেয়েছিল কিন্তু নেহরু সেই প্রস্তাব অস্বীকার করেছিলেন। ১৯৫৫ সালে রাশিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল কিন্তু তিনি তা বাতিল করেন ও চীন তা পেয়ে যায়। নেহরু কোকো দ্বীপ বার্মাকে উপহার দেন বার্মা তা চীনকে দেয়। চীন এখন সেখান থেকে ভারতের উপর গোয়েন্দাগিরি করেছে। স্বাধীনতা পাওয়ার পরেই আমেরিকা ভারতকে পারমাণবিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তাব দেয় কিন্তু নেহরু প্রত্যাখ্যান করেন। করলে চীনের আগে ভারত এনএসজির সদস্য হতে পারত। এখন ভারত চীনের দয়ার উপর নির্ভর করে বসে আছে। ১৯৪৭-এর অক্টোবরে পাঠান উপজাতিদের সামনে রেখে পাকিস্তান আর্মি কাশ্মীর আক্রমণ করে, সর্দার প্যাটেল ফৌজ পাঠান কিন্তু নেহরু সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণা করেন। পরে পাকিস্তান জম্মু-কাশ্মীরের এক-তৃতীয়াংশ দখল করে।

তবে সাম্প্রতিককালে ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে কিছু দৃঢ়তা দেখা যাচ্ছে। এর আগে ভারত কাশ্মীর সম্পর্কে জোরালো বক্তব্য রেখেছে বলে মনে হয় না। শক্তিমত্তা প্রদর্শনের উপযোগী পরিস্থিতিতেও ভারত তার বক্তব্যকে মৃদু ভাষায় আড়াল করেছে। ভারত নিজেকে নৈতিক শক্তিসম্পন্ন দেশরূপে প্রদর্শন করতে চেয়েছে গান্ধী, অরবিন্দ ঘোষ ও অন্যান্যদের মতো জাতীয় আন্দোলনের পুরোধাদের অনুকরণে। একদিকে স্বার্থপর আমেরিকা, অন্যদিকে বলদর্পী আগ্রাসী চীন ও তার লেজুড় পাকিস্তান, এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতের নিজ স্বার্থে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে শক্তি প্রদর্শন করার। তা দেখা গেছে নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে সার্জিকাল স্ট্রাইক করে জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়া, ভারতীয় বাহিনীর দ্বারা ডোকলাম উপত্যকায় চীনের আগ্রাসনের সফল মোকাবিলা এবং ৩৭০ ধারা বিলোপকরণের মধ্যে। ভারতের স্বার্থে যে বা যারা আঘাত হানবে তাদের সমঝে দেওয়া হবে যে ভারত তার সমুচিত জবাব দেবে। ভারতের কূটনীতিকরা বুঝিয়ে দিয়েছে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অংশ এবং একদিন তার উপর আমাদের দখলদারি থাকবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সেপ্টেম্বর মাসে নতুন সরকারের প্রথম ১০০ দিন পূর্তির সময়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, ''পাক অধিকৃত কাশ্মীর সম্পর্কে আমাদের অবস্থান সর্বদাই স্বচ্ছ থেকেছে আর ভবিষ্যতেও থাকবে। পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অংশ আর আমরা আশা করি একদিন আমাদের দখলদারী থাকবে।'' দু' দেশের মধ্যেকার আলোচনার সমস্যাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন, ''সমস্যা হচ্ছে পাকিস্তান শুধু কথাই বলে চলেছে আর কিছু নয়। তারা মনে করে যে সুন্দর কথা বলতে পারাটাই সমাধান। কিন্তু

যে জঙ্গি ইসলামকে পাকিস্তান শিল্পে পরিণত করেছে তাকে ধ্বংস করে ফেলাই একমাত্র সমাধান।" ভারতের কূটনীতির এটা এক বিরাট সাফল্য ও চীনের পক্ষে লজ্জার যে মালয়েশিয়া ও তুর্কীস্থান ছাড়া আর কোনো দেশ কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের পাশে দাঁড়ায়নি।

মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রপতি মহাথির মহম্মদ

বলেছেন কাশ্মীর সম্পর্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও সেই দেশ (পড়ুন কাশ্মীর) আক্রান্ত হয়েছে। এর জবাবে বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র রাবিশকুমার বলেছেন, অন্য সব দেশীয় রাজ্যের মতো জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে, কিন্তু পাকিস্তান আক্রমণ করে জে অ্যান্ড কে-র অংশ দখল করেছে। তিনি মালয়েশিয়াকে এও বলেছেন যে দু' দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা মনে রেখে যেন তিনি এইরকম মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন।

তুর্কীস্তানের প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন, ইউএনও-র প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও কাশ্মীরে ৮০ লক্ষ লোক অবরুদ্ধ হয়ে আছেন। রবিশকুমার জবাবে বলেছেন, ''আমরা তুর্কী সরকারকে জানাচ্ছি তারা যেন আর কোনো মন্তব্য করার আগে বাস্তব পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করেন। এটা সম্পূর্ণরূপে ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়।" চীন-পাকিস্তান মিলে যত পাম তেল মালয়েশিয়া থেকে কেনে ভারত কেনে তার থেকে বেশি। ভারতীয় আমদানি কারকরা ভাবেন যে ভারত সরকার আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে দেবে, এতে মালয়েশিয়ার পাম তেলের বাজার ধাক্কা খায়। ভারত সরকার ভারতীয় পর্যটকদের সেদেশে যাওয়ার আগে সবরকম সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেন। নরেন্দ্র মোদী সাইপ্রাস ও আর্মেনিয়ার নেতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে একথা বুঝিয়েছেন। ভারত তুর্কীস্তানে তার প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের, যেমন বিস্ফোরক রপ্তানি কমিয়ে দিয়েছে, এজন্য তুর্কীস্তানের আন্দালু শিপইয়ার্ড ২৩০০ কোটি ডলার ফ্লিট শিপ সাপোর্ট সরবরাহের প্রকল্পে লোকসান করতে পারে। সিরিয় কুর্দদের উপর তুর্কীস্তানের আক্রমণকেও তীব্র ভর্ৎসনা করে ভারত বিবৃতি জারি করেছে।

সম্প্রতি পররাষ্ট্র দপ্তর মুখপাত্র রবিশকুমার কাশ্মীরের ব্যাপারে চীনের ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিয়েছেন। এক বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছেন চীন পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালনের বাহানা করছে অথচ সে নিজেই অবৈধভাবে ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরের বিস্তৃত এলাকা দখল করে রেখেছে। ১৯৬৩ সালে চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পাদিত এক সীমান্ত চুক্তি অনুসারে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের একটি অংশ (আকসাই চীন) পাকিস্তান চীনের হাতে তুলে দিয়েছে। —''আমরা আশা করি যে অন্যান্য দেশ ভারতের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে সম্মান দেবে। চীন কেন্দ্র-শাসিত জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের বিশাল এলাকা দখল করে রেখেছে।"

এতকাল চীনের প্রতি ভারতের প্রতিক্রিয়া খুব নিষ্প্রভ ছিল। চীনের তিব্বত দখল কর্তৃত্বপরায়ণ চীনকে ভারতের সীমান্ত এলাকার নদীপথের উপর নিয়ন্ত্রণের সুযোগ করে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে চীন যে সমস্ত নদী নিয়ন্ত্রণ করে তার বেশিরভাগ শিনজিয়াং ও তিব্বত দখল করার ফলশ্রুতি আর এই দুটো প্রদেশই চীনের কমিউনিস্ট শাসনের বিরোধিতা করছে। স্বাধীনতার পরে ভারত যখন এশিয় ঐক্যের ভ্রান্ত স্বপ্ন দেখছিল চীন তার এলাকা দখল বাড়িয়ে যাচ্ছিল। ১৯৬২ সালের চীনের বেইমানির কথা সর্বজনবিদিত। সেই থেকে চীন ভারতের ১৪০০০ বর্গকিমি এলাকা দখল করে রেখেছে। সেই যুদ্ধে

> "ভারতের কূটনীতির এটা এক বিরাট সাফল্য ও চীনের পক্ষে লজ্জার যে মালয়েশিয়া ও তুর্কীস্থান ছাড়া আর কোনো দেশ কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের পাশে দাঁড়ায়নি।"

ভারতের ৩০০০-এর অধিক জওয়ান নিহত হয়। ভারত যখন 'এক চীনে'র অস্তিত্ব (মানে তাইওয়ানকে স্বীকৃতি না দেওয়া) ও তার বাজার অর্থনীতিকে সমর্থন জানিয়েছে, চীন পাকিস্তানকে তার ভারত-বিরোধী ষড়যন্ত্রে উৎসাহ জুগিয়েছে। বিবৃতিতে ভারত জানিয়েছে চীন যেন ভারতের সদুদ্দেশ্যর প্রতিদান দেয় নতুবা ভারত চীনের সংবেদনশীল বিষয় ও অবৈধ দখলদারিকে জগতের সামনে তুলে ধরবে।

হংকং-এ সংকট, ইউএস-এর সঙ্গে বাণিজ্যযুদ্ধ, চীনের হ্রাসমান জিডিপি, পাকিস্তানের জঙ্গিমদত-এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক চাপ চীনকে বুঝিয়ে দেবে তাকে তার ঐতিহাসিক বন্ধু ভারতকে চটানোর কী খেসারত দিতে হয়। ভারতকে বিশ্বের সংবাদমাধ্যমে এই বিষয়গুলো সম্যকভাবে তুলে ধরতে হবে। এটা ভারতের ঐতিহাসিক দুর্বলতা। ৩৭০ ধারা বিলোপ নিয়ে অতিশয় অভিযোগ ও অবৈধ দখলের বিষয়ে নিশ্চুপ থাকা সেই দুর্বলতাকে প্রকট করে। ■

কলকাতার ছেলে বিবেকানন্দ

বিশ্ব বিজয় করে প্রথমে সিংহল, পরে মাদ্রাজ। মাদ্রাজের পরে সাইক্লোনিক সন্ন্যাসী এবার কলকাতায়। কলকাতারই ছেলে বিবেকানন্দ ফিরে এসেছেন পাশ্চাত্যে ভারতের সনাতন ধর্মের বিজয়কেতন উড়িয়ে। তাঁরই অভ্যর্থনার জন্য চারদিকে সাজ সাজ রব। দক্ষিণ ভারত এই বিজয়ী বীরকে সংবর্ধনা জানিয়েছে রাজকীয় মহিমায়। এবার কলকাতা তাঁর সুভাগমনের প্রতীক্ষায়। ঘরের ছেলেকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য জমকালো এক সংবর্ধনা কমিটি গঠিত হলো সেকালের কলকাতার সেরা মানুষদের নিয়ে।

কলকাতা সত্যিই সেদিন উদ্দীপ্ত। তার বিশ্বজয়ী বেদান্তকেশরী ঘরের ছেলের শুভাগমন প্রতীক্ষায় উন্মুখ কলকাতার জনমানস ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭, শুক্রবার। দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষে তিনি এলেন বিজয়ী বীরের মতোই। মাদ্রাজ থেকে আসা মোম্বাসা স্টিমার কলকাতার অদূরেই বজবজে নোঙ্গর করে। তিনি স্পেশাল ট্রেনে বজবজ থেকে এলেন শুক্রবারই সকালে শিয়ালদহে। সেদিন শিয়ালদহ রেলস্টেশন উৎসবের রূপ ধারণ করেছিল। মোটামুটি হিসেবে ২০ হাজার লোক সমবেত হয়েছিল। সমাজের সর্বস্তরের লোক এসেছিল স্বামীজীকে সম্মান ও হৃদয়ের অভ্যর্থনা জানাতে। সমস্ত পথটি ধ্বজ-পতাকা, পত্রপুষ্প এবং বিভিন্ন তোরণে সজ্জিত ছিল, উপরে স্বাগতবাণী লিখিত। পথিপার্শ্বে সকল বাড়ির বারন্দা, ছাত নর-নারী ও শিশুতে বোঝাই। ঠিক সাড়ে সাতটার সময়ে স্বামীজী এবং তাঁর কয়েকজন ইউরোপীয় ও ভারতীয় বন্ধুকে নিয়ে স্পেশাল ট্রেন প্লাটফর্মে প্রবেশ করে। চতুর্দিকে তখন উৎসাহ উদ্দীপনার অবধি নেই, সবাই উদগ্রীব, কীভাবে এগিয়ে গিয়ে তাদের বর্তমান হিরোর কাছে উপস্থিত হওয়া যায়। বিস্তৃত প্লাটফর্মেও জনতার এমন প্রচণ্ড চাপ যে, কষ্টে নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সে দৃশ্য অতি গরিমাময়, যা এই স্থানে পূর্বে দেখা যায়নি। স্বামীজী অবতরণ করা মাত্র তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে একটি ফিটনে তোলা হলো। অন্য গাড়িতে তাঁর বন্ধুদের। তাঁদের নিয়ে ফিটন যখন ধীরে ধীরে বিরাট জনমণ্ডলীকে ভেদ করে অগ্রসর হলো তখন হর্ষধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত। স্বামীজীর পশ্চাতে চলল বাদক দল ও সংকীর্তন দলগুলি। তারপর গাড়ির স্রোত। সারা পথে

'স্বামী বিবেকানন্দ কী জয়' উচ্চ উল্লাসধ্বনি।

স্বামীজীর বিজয়রথ তথা ফিটন গাড়ি কিন্তু ঘোড়ায় টানেনি। এক গভীর উন্মাদনায় সে গাড়ি ছাত্ররাই ঘোড়া খুলে টেনে নিয়ে গিয়েছিল রিপন কলেজ পর্যন্ত। স্বামীজী তাতে আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু চারুবাবু বললেন, আমরা আপনাকে সংবর্ধনা দিচ্ছি, আপনার আপত্তি টিকবে না। এরা রিপন কলেজ পর্যন্ত আপনাকে টেনে নিয়ে যাবে।

ঠিক কথাই তো! যে কলকাতার ছেলে বিবেকানন্দ ঘোর দুর্দিনে সমস্ত জাতিকে টেনে নিয়ে গেছেন অন্ধকার থেকে আলোতে, ফিরিয়ে দিয়েছেন তদের লুপ্ত গৌরব, জাতীয় দুর্দিনে সেই নেতকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার বহন করে নিয়ে যাওয়ার যোগ্যতা বা গৌরব অর্জন করতে পারবে না সেই কলকাতার ছেলেরা, বিশেষত তারা যখন বিবেকানন্দের প্রাণের আগুনেই টগবগ করে ফুটছে?

তারপর ২৮ ফেব্রুয়ারি শোভাবাজার রাজবাড়িতে কলকাতাবাসীদের তরফ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। কলকাতার যুবকদের উদ্দেশে তিনি বললেন, 'আমিও এক সময় এই কলিকাতার রাস্তায় তোমাদের মতো খেলিয়া বেড়াইতাম। যদি আমি এতখানি করিয়া থাকি, তবে তোমরা আমার অপেক্ষা কত অধিক কাজ করিতে পারো। ওঠো, জাগো, জগৎ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। ভারতের অন্যান্য স্থানে বুদ্ধিবল আছে, ধনবল আছে, কিন্তু কেবল আমার মাতৃভূমিতেই উৎসাহাগ্নি বিদ্যমান। এই উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হইবে, অতএব হে কলকাতাবাসী যুবকগণ। হৃদয়ে এই উৎসাহের আগুন জ্বালিয়া জাগরিত হও।'

ধন্য কলকাতা! কলকাতার বড়ো গৌরব তার এই বিশ্বজয়ী বীর সন্তানকে নিয়ে। বিবেকানন্দের প্রাণস্পর্শে জেগে উঠেছে পরাধীন ভারতের অবদলিত,লাঞ্ছিত, হতাশ যুবসম্প্রদায়। ভারতীয় 'রেনসাঁস'-এর চরম উত্তেজনার মুহূর্ত সেসময়। বিবেকানন্দের আহ্বানে শত শত যুবকদল মাতৃভূমির জন্য কিছু একটা করতে চায়। পরধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার জন্য তারা লড়তে চায়, মরতে চায়। আর সেই মহাজাগরণের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা। কলকাতার ছেলে বিবেকানন্দর আহ্বানের এমনই আকর্ষণ।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, বিরাট কর্মযজ্ঞের সূচনা করে তিনি মাত্র ৩৯ বছর বয়সেই বাঞ্ছিতলোকে চলে গেলেন। কিন্তু না, কলকাতার ছেলে বিবেকানন্দের প্রাণস্পন্দন আজও থামেনি। সেই দুর্দমনীয় 'সাইক্লোনিক' সন্ন্যাসী লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেলেও 'বিবেকানন্দ ঝড়' আজও স্তিমিত হয়নি। তাঁর দেহত্যাগের একশো বছরের মধ্যে সারা বিশ্বে দেশ-কাল-জাতি-ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সব গণ্ডি ভেঙে বিবেকানন্দের সর্বজনীন ভাবপ্লাবন তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(স্বামী দেবেন্দ্রানন্দের 'সচিত্র সাইক্লোনিক সন্ন্যাসী' থেকে নেওয়া)

ভারতের পথে পথে

মায়াবতী

স্বামী বিবেকাননদের স্মৃতিবিজড়িত স্থান কুমায়ুন হিমালয়ের অপূর্ব সুন্দর এই মায়াবতী। স্বামীজীর দুই সুইস শিষ্য সেভিয়ার দম্পতির উদ্যোগে ১৮৯৯ সালে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মতিথিতে এখানে অদ্বৈত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়। এর আসল নাম মাঈপেঠ অর্থাৎ মায়ের পীঠ। মায়াবতী নামকরণ স্বামীজীর। ১৯০১ সালের জানুয়ারি মাসের বেশ কয়েকদিন স্বামীজী এখানে অবস্থান করেন। স্বামীজীর বাসগৃহে এখন লাইব্রেরি ও ধ্যানকক্ষ হয়েছে। আশ্রম থেকে ৪ কিলোমিটার উপরে উঠে আরও ৩০০ মিটার উঁচুতে ধ্যানস্তীর এক মায়াময় পরিবেশে স্বামীজী উপাসনায় বসতেন। এখানে স্মারক রূপে ধ্যানঘর তৈরি হয়েছে। আশ্রমের নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে শীর্ণকায়া সারদা নদী। এখানকার দৃশ্য নয়ানভিরাম। ফুলে-ফলে ভরা আশ্রম লাগোয়া হাসপাতাল, গোশালা ও চাষের জমি তীর্থযাত্রী ও পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। এখান থেকেই দেখা যায় সার দিয়ে দাঁড়িয়ে নন্দাদেবী, নন্দাখাত, পঞ্চচুলী, কামেট ও ত্রিশূল পর্বতচূড়া। মায়াবতীর জংশন স্টেশন লোহাঘাটেরও আকর্ষণ রয়েছে পর্যটকদের কাছে।

জানো কি?

স্বামী বিবেকানন্দ

● জন্ম : ১২ জানুয়ারি,পৌষ কৃষ্ণ সপ্তমী। ● স্থান : কলকাতা, সিমলা। ● মাতা-পিতা : বিশ্বনাথ দত্ত ও ভুবনেশ্বরী দেবী। ● শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শন : ১৮৮১। ● বিএ পরীক্ষা ও বাবার মৃত্যু : ১৮৮৪ ● বরানগর মঠে সন্ন্যাস গ্রহণ : ১৮৮৭। ● পরিব্রাজক রূপে ভারত ভ্রমণ : ১৮৮৮ ● কন্যাকুমারীতে শ্রীপাদশিলায় ধ্যান : ১৮৯২,২৫-২৭ ডিসেম্বর। ● চিকাগো বিশ্বধর্ম সম্মেলনে ভাষণ : ১৮৯৩, ১১ সেপ্টেম্বর। ● ভারতে প্রত্যাবর্তন : ১৮৯৭ ●

ভালো কথা

গোসাপ

আমার কাকা একজন পশুচিকিৎসক। তিনি আমাদের গ্রাম ও আশেপাশর বিভিন্ন বানিতে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির চিকিৎসা করে থাকেন। আমিও মাঝে মধ্যে তাঁর সহকারী হই। গত বছর শীতকালে সকালে গ্রামের পূর্বদিকে কর্মকার পাড়ার এক বাড়িতে গোরুর চিকিৎসা করে আড়বিলের খালের ধারের মোটোপথ দিয়ে দুজনে সাইকেলে ফিরছি। তখন বেলা ৯টা। সোনালি রোদ ঝলমল করছে। দেখি তিন-চারটি ছেলে একটা বড়োসড়ো গোসাপকে দড়ি দিয়ে বেঁধে মারতে মারতে খালের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কাকা সাইকেল থামিয়ে গোসাপটাকে মারার কারণ জিজ্ঞাসা করতে ওরা বলল ওটা নাকি ওদের পুকুরের মাছ খেয়ে ক্ষতি করছে। কাকা গোসাপটিকে ছেড়ে দিতে বলল। কিন্তু ওরা রাজি হলো না। কাকা তখন একশো দিতে চাওয়ায় ওরা রাজি হয়ে গোসাপটিকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। আমরা কাঁচি দিয়ে দড়ি কেটে ওষুধ লাগিয়ে পাশের জঙ্গলে ছেড়ে দিলাম। সেদিন অসহায় আহত বিপন্ন বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীটিকে বাঁচিয়ে আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল। এরজন্য কাকাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম।

জয়জিৎ মণ্ডল, নবম শ্রেণী, বসিরহাট, উত্তর ২৪পরগনা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি

গার্গী সরকার, ষষ্ঠ শ্রেণী, বারুইপুর, দঃ ২৪ পরগনা।

দক্ষিণবঙ্গে ঝমঝম বৃষ্টি
উত্তরবঙ্গে শিলাবৃষ্টি
এ নয়তো মোটে অনাসৃষ্টি।

উত্তরবঙ্গ শীতের দেশ
তাতেই ওরা আছে বেশ
দক্ষিণবঙ্গে একটু রেশ।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। ডাক্তার হেডগেওয়ার।। ১৯।।

মানুষ যাচাইয়ে এবং যোগ্য লোকের কথা মনে রেখে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়ানোয় ডাক্তারজী খুব কুশল ছিলেন। সেই কারণে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকরকে যখন নাগপুরে দেখলেন, তখন ডাক্তারজী নিজেই গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেন।

ম্যাট্রিক পাশ করে মাধব মূলে নামে এক কিশোর স্বয়ংসেবক কোঙ্কন জেলায় নিজের বাড়ি যাবেন, বিদায় জানাতে ডাক্তারজী নিজে হাজির হলেন স্টেশনে

ডাক্তারজী পুণা গেলে সঙ্ঘের প্রারম্ভিক বৈঠক মারাঠি সাহিত্য সম্রাট এন সি কেলকরের বাড়িতে হতো। চুলচেরা বিচারে অভ্যস্ত পণ্ডিতরাও সঙ্ঘকার্যের প্রশংসা করলেন।

১৯৩৪ সাল। সঙ্ঘের ওয়ার্ধা জেলার শিবির হচ্ছে গান্ধীজীর বাসস্থানের কাছেই। শিবিরের বাসগৃহ নির্মাণ, অনুশাসন, বাজনা ইত্যাদির কথা শুনে গান্ধীজীর মনে আগ্রহের সৃষ্টি হলো। ২৫ ডিসেম্বর সকাল ৬টায় এলেন শিবির দেখতে।

আমরা কি স্বামীজীকে সত্যিকারের গ্রহণ করেছি

প্রীতীশ তালুকদার

সোনার চামচ মুখে করে যারা জন্মেছে, যারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার উকিল, ব্যারিস্টারের ছেলে, তারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, ব্যারিস্টার হবে তাতে তেমন কী বিশেষত্ব আছে। তারা অনুকূল পরিবেশ পেয়েছে, প্রাচুর্য পেয়েছে, হাত ধরে শেখানো ও পথ দেখানোর মানুষ পেয়েছে। কিন্তু প্রত্যন্ত গ্রামের নিরক্ষর হতদরিদ্র চাষার বেটা যখন সহস্র প্রতিকূলতাকে পায়ে মাড়িয়ে রক্ত ঝরিয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ওঠে তখন তাকে বিশেষ বলতেই হয়।

১৮৬৩-র জানুয়ারি— ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও আন্দোলন তখনও দানা বাঁধেনি। এক দিকে পরাধীনতা, অপর দিকে চরম ক্ষুধায় নিমজ্জিত শিক্ষাহীন, সংস্কারহীন, ধর্মের নামে বাহ্য কুসংস্কার আর অধর্মে নিমজ্জিত জাতি। সেই ব্রিটিশ রাজত্বের রাজধানী কলকাতার তাঁবেদার চাটুকার সমাজে তাঁর জন্ম। তারপর বিলে থেকে বিবেকানন্দ হয়ে ওঠার রোমহর্ষক কাহিনি।

আদালতের অ্যাটর্নির ছেলে, একটা সচ্ছলতা ও ঠাঁটবাটের পরিবেশ ছিলই; শিক্ষাও বিদেশি ব্রিটিশের চোখ দিয়ে। পিতা বিশ্বনাথ দত্তের আকস্মিক প্রয়াণ গোটা পরিবারটাকে টেনে নামালো বাস্তবের শক্ত রুক্ষ মাটিতে। আয় থাকলেও ব্যয় ছিল বেহিসেবি, তাই সঞ্চয় নাই, ঘাড়ের উপর শরিকি সম্পত্তি বিবাদের মামলা। ঘরে বৃদ্ধা মা, অনেকগুলো ভাই-বোন। আশ্রয়টুকু বাঁচাতে টাকা চাই, এতোগুলো মানুষের খোরাক চাই। যখন চোখে রঙিন স্বপ্ন নিয়ে ওড়ার কথা তখন দ্বারে দ্বারে হন্যে হয়ে ঘুরছেন নব যুবক নরেন্দ্রনাথ দত্ত একটা চাকরির আশায়। দুঃখ, কষ্ট, বেদনা, হতাশা, অসহায়তা সম্ভবত মানুষকে অলৌকিকে বিশ্বাসী করে তোলে, সব দরজা বন্ধ হয়ে গেলে হয়তো ওই একটি দরজার ক্ষীণ আলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে আশা জাগিয়ে। তাই সাধু-সন্ত ধর্মাত্মাদের দ্বারে দ্বারেও ঘুরলেন, শেষ মনে ধরল দক্ষিণেশ্বরের পাগলা ঠাকুর গদাধর চাটুজ্যেকে।

কে কাকে ধরল, নরেন ঠাকুরকে, নাকি ঠাকুর নরেনকে তা বলা শক্ত। দৈব সংযোগ

বা পূর্ব নির্দিষ্ট লিখন? হতেও পারে। একের প্রতি অপরের আকর্ষণ বাড়তে লাগল দিনে দিনে। যুবক নরেনের মনের অন্তঃস্থলে হয়তো এর মধ্যে দিয়েই হতে লাগল নতুন করে ভাঙা-গড়ার খেলা; সংসার দায়ে ন্যুব্জ বেকার যুবক নরেনের মধ্যে অজান্তেই বিবেকানন্দ বিকশিত হতে শুরু করল। তবে আত্মমর্যাদা সচেতন নরেনকে এক দিক থেকে কুরে কুরে খেতে থাকল সংসারের অভাব, মায়ের শুষ্ক মুখ, ভাই-বোনেদের ভরসা দেওয়া আর ভিটেটুকু বাঁচাবার দায়। পাগলা ঠাকুর তা মনে মনে বুঝতেন। এক দিন পেড়ে বসলেন সে কথা। বললেন, যা, মা ভবতারিণীর কাছে গিয়ে চেয়ে নে। অকূল পাথারে নরেন যেন হাতে নৌকো পেয়ে গেল, সংকোচ ত্যাগ করে আশাভরে ছুটে গেলেন মায়ের মন্দিরে। চাইলেন— মা আমাকে জ্ঞান, দাও, বিবেক দাও বৈরাগ্য দাও।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেহ রেখে স্বধামে চলে গেছেন। ঠাকুরের ত্যাগী শিষ্যরা নিজদের গুঁটিয়ে নিয়ে যে যার সংসারে মন দিয়েছেন। পারল না নরেন আর তার সমবয়সী দশ-বারোজন যুবক। নরেন চেয়েছিল নির্বিকল্প সমাধি, আর ঠাকুর খেপে উঠে বলেছিল— কী বললি তুই! ছিঃ ছিঃ নরেন, শুধু নিজের কথাই ভাবলি! তাকিয়ে দেখ, অশিক্ষিত, ক্ষুধার্ত, অসহায় মানুষগুলোর দিকে। কোথায় বটবৃক্ষ হবি, তোর ছায়ায় ওরা আশ্রয় পেয়ে শীতল হবে তা না...। একটা সেকেলে গ্রাম্য অশিক্ষিত অর্ধ উন্মাদের মনে এত বড়ো চিন্তার বিকাশ কীভাবে হলো তা কি কেউ বলতে পারে!

নরেন, রাখাল, শরৎরা এক বস্ত্রে বলরাম বসুর জরাজীর্ণ বাগানবাড়িতে গিয়ে উঠলেন। বিরজা হোম করে নিজেরাই নিজেদের দীক্ষিত করলেন সন্ন্যাসে। সমর্পণ হলো, কিন্তু পথ? বিশাল ভারতবর্ষ, বিশাল জাতি; এক দিকে শুধু নাই নাই আর নাই, অপর দিকে মুষ্ঠিমেয় শ্রেণী অপথে-কুপথে যত সম্পদ কুক্ষিগত করতে আর আমোদ-আহ্লাদে ভেসে যেতে ব্যস্ত। তার মাঝে তারা নাম-গোত্র সহায়- সম্বলহীন কৌপিনসার নব্য সন্ন্যাসী যুবক। কোন পথে পূর্ণ করবে তারা গুরুর অর্পিত কাজ! পথ খোঁজ পথ, পথের সন্ধানে বেরিয়ে পর পথে।

নরেন স্বামী বিবিদিশানন্দ হয়ে ভারতের পথে পথে। মাঠ-ঘাট- প্রান্তর, ধনীর প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের পর্ণ কুটির, সব ঘোরা হয়ে গেছে। বিশাল দেশ, সুবিশাল জাতি, সুজলা-সুফলা ভূমি অঢেল সম্পদ, অসীম কর্মশক্তি অথচ অদ্ভুত সহিষ্ণুতা। নাই স্বাভিমান, আত্মর্যাদা বোধ, উদ্যম, ঐক্য। তোমাদের ইতিহাস নাই, ঐতিহ্য নাই, সংস্কৃতি নাই, বলবীর্য নাই, নাই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। তোমরা অসভ্য,

ফঃ ৬

জংলি, সংস্কারহীন। প্রায় সাতশো বছরের বিদেশি শাসন আর অত্যাচারে বিশ্বাসটা গেঁড়ে বসেছে। যেন কোন মহা সাপিনীর সম্মোহনে আত্মবিস্মৃত মহাশক্তিধর সিংহ। যা নাই, যা হারিয়েছে তাই এদের মধ্যে সঞ্চার করতে হবে, কিন্তু পথ কই?

দক্ষিণে ভারতের একেবারে শেষ প্রান্ত, সামনে দিগন্ত বিস্তৃত সাগরের জলরাশি, বেলাভূমিতে দণ্ডায়মান যুবক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। ক্ষেত্রীর মহারাজ অজিত সিংহ এই নামকরণই করেছেন বিবিদিশানন্দ তথা নরেন্দ্রনাথের। আকাশ-পাতাল ভেবে চলেছেন সন্ন্যাসী। সাত-সাগর পারে আমেরিকায় তখন সাজো সাজো রব। আমেরিকা আবিষ্কারের চারশো বছর পূর্ণ হচ্ছে তাই জাতীয় উৎসব। প্রদর্শনী, আলোচনা চক্র, শিল্প, বিজ্ঞান সব তুলে ধরা হবে। গোটা বিশ্বকে ডেকে দেখানো হবে তারাই পৃথিবীতে সবচেয়ে উন্নত সভ্য শ্রেষ্ঠ জাতি। ধর্মটা বাদ যাবে কেন? খ্রিস্টধর্মই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম সেটাও প্রমাণ হয়ে যাক। বিশ্ব জুড়ে নিমন্ত্রণ ছড়িয়ে পড়ল। ভারতের প্রায় সকল ধর্মসম্প্রদায় এমনকী বাঙ্গলার আর্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজও ডাক পেল, পেল না শুধু ঐতিহ্যশালী সনাতন হিন্দুধর্ম। ঘনান্ধকারে পথের দিশা নাই, অপর দিকে অপমানের যন্ত্রণা। সকলে আমন্ত্রিত, শুধু উপেক্ষিত সনাতন হিন্দু! অনাহূত রূপেই কী সেখানে পাড়ি দেবেন তিনি? কিন্তু এ সমাজ তো তাঁকে প্রতিনিধি করেনি! তাঁর আকাঙ্ক্ষিত পথ কি ওখান থেকেই শুরু? হিন্দু সমাজ প্রতিনিধি না করুক, তারা আত্মমগ্ন, না আসুক নিমন্ত্রণ, তাঁর দায়িত্ব আছে। সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে উঠলেন শ্রীপাদ শিলায়, বসলেন ধ্যানে। তারপর ইতিহাস।

শিকাগো'র মঞ্চে পৌঁছানোর পথটা সহজ ছিল না অজ্ঞাত অনাহূত সন্ন্যাসীর পক্ষে। শেষ পর্যন্ত সব বাধা পেরিয়ে হয়ে বিশ্বধর্মসভার মঞ্চে অনুরণিত হলো 'মাই সিস্টারর্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অব্ আমেরিকা'। চিরন্তন ভারতের সনাতন ধর্মের উদঘোষ বার্তা 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'— এই জগতের সকলেই আমরা পরস্পরের আত্মীয়, ভাই। আমরা সকলেই সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধিকর্তা সর্বত্যাগী দেবাদিদেব শঙ্কর আর মা অন্নপূর্ণার সন্তান। যারা এতদিন নিজ ধর্ম, নিজ দেশ, নিজ জাতিকেই শ্রেষ্ঠ আর বাকিদের মিথ্যা কুসংস্কারাচ্ছন্ন অধর্ম ভাবত— তাদের সামনে ধর্মের নতুন রূপ উদ্ভাসিত হলো, খুলে গেল বিশ্বভ্রাতৃত্বের এক নতুন দুয়ার। পরম উল্লাসে উদ্বেলিত হলো পাশ্চাত্য। ডাকের পর ডাক, সকলেই স্বামীজীর কথা শুনতে চায়, জানতে চায় এই ভারতকে, ভারতের সনাতন হিন্দু ঋষিগণের প্রজ্ঞালব্ধ উপলব্ধিকে। জয়-জয়কার স্বামীজীর, জয়জয়কার ভারতের, সনাতন হিন্দুধর্মের। স্বামীজী হয়ে উঠলেন 'দ্য সাইক্লোনিক হিন্দু মঙ্ক অব ইন্ডিয়া'।

ঢেউটা ভারতে আছড়ে পড়তে দেরি লাগল না। প্রাসাদের দরজায় অবনত কুণ্ঠিত ভিখারি নিজের কুটিরের মাটির নীচে হঠাৎ ঘড়া ঘড়া মোহর ধনরত্নের সন্ধান পেলে যেমন নিমেষে তার শরীরী ভাষা পাল্টে যায়, তেমনই ঘটল ভারতে। ভারতবাসী জানতে পেরেছে তারা হীন নয়, তাঁদের আছে সুপ্রাচীন ইতিহাস, উন্নত সংস্কৃতি, মহৎ দর্শন। আজকের ইউরোপ আমেরিকার সভ্যরা যখন উলঙ্গ হয়ে বনে-জঙ্গলে ঘুরত তারও আগে ভারতের সন্তানেরা সৃষ্টি করেছে উন্নত সভ্যতা, সুবিশাল জ্ঞানভাণ্ডার। সারা পৃথিবী ভারতের একটা গ্রাম্য সহজ-সরল মূর্খের সামনে বসেও মহান মানবতার সর্বোচ্চ শিক্ষা নিয়ে নিজেদের সার্থক করতে পারে।

আসলে নিদ্রায় মগ্ন সিংহের শিরায় শিরায় খেলে গেল বিদ্যুৎ প্রবাহ। পেশিতে পেশিতে হলো শক্তির সঞ্চার। মেরুদণ্ডটা শক্ত হয়ে শির হলো উন্নত। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, ''ওরে তুই ওঠ আজি, আগুন লেগেছে কোথা, কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি, জাগাতে জগৎ জনে''। উদ্বেলিত ভারত। অজ্ঞাত অখ্যাত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ভারতে ফিরলেন রাজার রাজা হয়ে। বিশ্ববাসীর হৃদয় জয় করে। খুলে গেছে সকল ঘরের দুয়ার, সবাই পথে; আহ্লাদে আত্মহারা তারা তাদের আনন্দাশ্রুতে স্বামীজীর পা ধুয়ে দিতে চায়। স্বামীজী পদার্পণ করেই মাথা ঠেকিয়ে সর্বাঙ্গে মেখে নিলে মাতৃভূমির পবিত্র মৃত্তিকা। রামনাদের মহারাজ তাঁর রাজকীয় জুড়ি গাড়িতে তুলে নিলেন স্বামীজীকে। তারপর ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে ভাইকে নিয়ে নিজেরাই সে গাড়ি টেনে চললেন পথ দিয়ে, সামনে-পিছনে অসংখ্য জনতা। কলকাতার ছাত্ররাও ঘোড়া খুলে রেখে নিজেরাই টেনে নিয়ে গেছে স্বামীজীকে।

স্বামী বিবেকানন্দ যদি আমেরিকার বিশ্বধর্ম সম্মেলনে না যেতেন তবে কী আজকের বিবেকানন্দ হয়ে উঠতেন? জ্ঞান, গুণ, কর্ম, সেবা, মহত্ত্ব নিয়ে যে বিবেকানন্দ সে বিবেকানন্দ তেমনই থাকতেন, আমরা হয়তো চিনতাম না তাঁকে, তাঁর বিশালতা ও গ্রহণযোগ্যতা হয়তো স্বীকারই করতাম না। আর পাঁচটা সন্ন্যাসীর মতো দ্বারে দ্বারে ঘুরে চিৎকার করতে করতে 'তার জীবনদীপের নিষ্ফল নির্বাপণ ঘটত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কতিপয় মানুষের গুরুঠাকুর হয়ে আবদ্ধ থেকে যেতেন ঝুলকালি মাখা ঠাকুরঘরের কুলুঙ্গিতে। আমরা যে পরমুখাপেক্ষী, গুণীকে বোঝা ও তার মর্যাদা দেবার যোগ্যতা আমাদের নাই। অপরে স্বীকৃতি দিলে তখন আমরা ভক্ত হয়ে পড়ি।

তুমি ভারতবর্ষকে জানতে চাও? বিবেকানন্দকে জানো। সনাতন হিন্দু ধর্মকে জানতে চাও? জানো বিবেকানন্দকে। তুমি বিশ্বভ্রাতৃত্ব, মহত্ত্ব, উদারতা, গাম্ভীর্য, প্রেম, ত্যাগ, বীরত্ব জানতে চাও তো জানো বিবেকানন্দকে। মানবতাকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে চাও? জানো বিবেকানন্দকে। যজ্ঞাগ্নিতে সর্বস্য আহুতি দিয়ে মানুষ হয় সন্ন্যাসী, সবার। বিবেকানন্দ আদর্শ সন্ন্যাসী, আদর্শ মানুষ, আদর্শ রাষ্ট্রসন্তান, আদর্শ ধর্মবীর। যুবনায়ক, যুগনায়ক, বীর সন্ন্যাসী, সাইক্লোনিক হিন্দু, কত নাম তাঁর। তাঁর প্রয়াণে শতবর্ষ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, আজও তাঁর ছায়া ক্রমবর্ধমান। তবু তার মাঝেও মনে খচ্ খচ্ করে বাজে, আমরা কি তাঁকে সত্যিকারের গ্রহণ করেছি? ▮

মানবপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ

শৈলজা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

ঊনবিংশ শতকের পূর্বে ভারতের পূত সলিলে যে শুচিশুভ্র পদ্মটি ভারতবর্ষের পঙ্ক মথিত করে বিকশিত হয়ে তারই পবিত্র সৌরভে ভারতবাসীর মনকে আকৃষ্ট করে তুলেছিল—নাম তাঁর বীর্যদীপ্ত মহাবৈদান্তিক মহা সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি সমাজে, ধর্মে, সাহিত্যে এবং শিক্ষাগুরুরূপে ভারতের জাতীয়তার বিভিন্ন দিককে অনুপ্রাণিত করে স্বাধীনোত্তর ভারতের স্বপ্নকে রূপায়িত করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কর্ম করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ এক দিব্য জ্যোতিষ্ক, তা আমাদের ধরার বাহিরে, চোখে দেখা যায় কিন্তু ধরাছোঁয়া দেয় না। শৈশবে তাঁর মা বলতেন—শিবের কাছে চেয়েছিলাম--- ভূতনাথ আমার কাছে পাঠিয়েছেন আস্ত একটি ভূত।

বাঙ্গলাদেশে তখন বিখ্যাত ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক কেশবচন্দ্র সেনের যুগ চলেছে। বাঙ্গালি যুব চিত্তকে তিনি নিজ বাগ্মিতা—শক্তিতে দুর্নিবার ভাবে আকর্ষণ করেছেন। হিন্দুধর্মে যখন তাঁর বিশ্বাস একরূপ টলছে, হৃদয়ের কোণে উঁকি দিচ্ছে অবিশ্বাস। বয়ে চলেছে সংশয়ের ঝড়। তৎক্ষণাৎ কোনো এক দৈবী নির্দেশে বিধাতার অদৃশ্য অঙ্গুলি সংকেত। তিনি হঠাৎ দক্ষিণেশ্বর মা কালী মন্দিরের পরম দয়াল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে হাজির। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন পূর্ণ জাতীয়তাবোধই পারে মানুষের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করতে। যে শক্তি পারে পরাধীনতার শৃঙ্খলকে চূর্ণ করতে। তাই তিনি সমগ্র দেশবাসীর জাতীয় ঐক্য, ধর্ম এবং সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী করে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন।

মানুষের মধ্যেই যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, মানব সেবাই যে ঈশ্বর সেবা, ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে এই বিশ্বাস জাতির অন্তর থেকে অবলুপ্ত হয়। এই অবস্থা দেখেই তিনি ব্যক্তিগত মুক্তির সাধনা ছেড়ে জনকল্যাণে অনুপ্রাণিত করলেন এবং বললেন— দরিদ্র, পদদলিত, অজ্ঞ, এরাই হোক তোমাদের ঈশ্বর। তিনি তেমনি নর

ও নারায়ণের মধ্যে অভেদ কল্পনা করতেন। তিনি নির্ভীক ভাবে স্পষ্ট ভাষায় জাতীয়তার বাণী প্রচার করতে লাগলেন— 'ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও, নগ্নকে বস্ত্র দাও, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দাও, দুর্বলকে দাও শক্তি'— তাঁর সেই সমস্ত জ্বালাময়ী রচনা ও বক্তৃতা ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের নর-নারীকে নতুন উৎসাহে উদ্দীপিত করে তুলল। ১৮৯৩ সালে আমেরিকার চিকাগো শহরে ধর্মসভার অধিবেশনে তিনি হিন্দুধর্মকে সর্বধর্মের জননী বলে ঘোষণা করলেন।

বিশ্বধর্ম মহাসভায় সর্বধর্ম সমন্বয়ের—শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্য হয়ে তিনি এই সত্যই প্রচার করেছিলেন যে মানবপ্রেমই শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং ঈশ্বর লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা। শূদ্র হোক, চণ্ডাল হোক, মুচি, মেথর-মুদ্দফরাস হোক— তারা সকলেই যে মানুষ এবং একই স্রষ্টার সৃষ্টি, আমাদের সমাজের তথাকথিত বর্ণশ্রেষ্ঠরা যখন তা ভুলে যায়, অথচ মুখে বলে— যত্র জীবস্তত্র শিবঃ। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' তখন স্বভাবতই তাদের ভণ্ডামি প্রকাশ হয়ে পড়ে।

বিবেকানন্দের এই মানবপ্রেম পাশ্চাত্যদেশের বিদগ্ধ সমাজকেও প্রভাবান্বিত করেছিল। ইংলণ্ডে এবং আমেরিকার অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর প্রতিভা ও প্রচারিত বেদান্ত দর্শনের অভিনবত্বে মুগ্ধ যাঁরা হয়েছিলেন, তাঁর মধ্যে মার্গারেট নোবেল উল্লেখযোগ্য। এই মার্গারেট বিবেকানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়ে 'নিবেদিতা' নামে জগতে পরিচিতা হন। মনীষী রোমাঁ রোল্যাঁ ছিলেন স্বামীজীর একান্ত অনুরক্ত ভক্ত। বিবেকানন্দ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিতেই বিবেকানন্দ শক্তিমান, নিজ মহাগুরুর উপলব্ধ সত্যকেই বিবেকানন্দ ভারতে ও বহির্বিশ্বে প্রচার করেছেন।

বিবেকানন্দ এক বৈদান্তিক মহা সন্ন্যাসী। সমাজ সংস্কারকে কখনও তিনি মায়া প্রপঞ্চ বলে ভাবেননি। জগৎ ও জীবন তার চোখে কখনও মরীচিকাবৎ প্রতিভাত হয়নি। বিবেকানন্দের মতে আর্তমানবের, হীন পতিতের সেবা; দয়া নয়। এ ঈশ্বরের পূজা--- ব্রহ্ম স্পর্শের নামান্তর মাত্র। বিবেকানন্দ মানবপ্রেমিক। দেশবাসীকে স্বদেশসেবায় অনুপ্রাণিত করেছেন। দেশ প্রীতি তাঁর নিকট ছিল রক্তের সংস্কার, প্রাণের অতৃপ্ত ক্ষুধা। এই জন্যই তিনি দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলেছিলেন— 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী হলো 'রাজযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, প্রাচ্য পাশ্চাত্য ইত্যাদি।

তাঁর ধর্মমতের মূল সূত্র এই বইগুলির মধ্যে নিহিত রয়েছে। বিবেকানন্দ আমাদের জাতীয় ধর্মের স্রষ্টা, আজকের যে জাতীয়তাবোধ নিয়ে আমরা গর্ব করি, তিনি হলেন তার আদি স্রষ্টা। বিবেকানন্দের অনুসৃত পথেই বর্তমান ভারতের জয়যাত্রা।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মহামহোপাধ্যায় ড. সীতানাথ গোস্বামী

ড. প্রজ্ঞারঞ্জন দত্ত

অলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারী আমার আচার্যদেব মহামহোপাধ্যায় ড. শ্রীসীতানাথ গোস্বামী, বেদ-বেদান্ত- ব্যাকরণতীর্থ (পাণিনি), বেদ-রত্ন, রানি রামরক্ষী স্বর্ণপদক, রাষ্ট্রপতি সম্মান, অরবিন্দ পুরস্কার ও বাচস্পতি উপাধিপ্রাপ্ত এবং বহুল গুণসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তাঁর 'পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বিদ্বৎসম্মান প্রাপ্তি' উপলক্ষ্যে গত ১৬ নভেম্বর, ২০১৯ শনিবার, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচার, গোলপার্কের প্রেমানন্দ হলে এক বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়। আয়োজক ওই প্রতিষ্ঠানের বেদান্তের ছাত্র-ছাত্রীরা। একই দিনে একসঙ্গে আরও চারটে অনুষ্ঠান হয়। শিক্ষক দিবস, অধ্যাপক গোস্বামীর শিক্ষাগুরু মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ বাগচী, তর্ক-সাংখ্য- বেদান্ততীর্থ; ডি.লিট্ প্রথম বার্ষিকী সভা, বিজয়া উপলক্ষ্যে সম্মেলন এবং বেদান্তের প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের নবীনবরণ উৎসব। এরই সঙ্গে আরও একটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ ছিল— আমাদের পরমগুরুর নামাঙ্কিত মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ -রচনাবলির অন্যতম খণ্ডের (৫টি বইয়ের একত্র সঙ্কলন) প্রকাশনার আনুষ্ঠানিক উৎসব। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে সভার শুভ সূচনা। প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী সুপর্ণানন্দ মহারাজ উল্লিখিত অনুষ্ঠানগুলোর তাৎপর্য এবং মহিমা অতি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বরেণ্য ব্যক্তিদের সম্মানিত করা হয়। সম্মানিত হন প্রকাশনার জন্য 'সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার'-এর কর্ণধার দেবাশিস ভট্টাচার্যও। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকারা এই সভা অলংকৃত করেন। অধ্যাপক গোস্বামী অতি সুন্দরভাবে তাঁর গুরু মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ বাগচীর গুণকীর্তন করেন। অধ্যাপক গোস্বামীর বিশেষ স্নেহধন্য বেদান্তের ছাত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনবিভাগের অধ্যাপক ড. প্রীতম ঘোষাল 'বেদান্তের ব্যাপকতা' বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করার চেষ্টা করেন। এই সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন— প্রব্রজিকা আপ্তকামা মাতাজী মহোদয়া, সঙ্গীত বিশেষজ্ঞা গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রদ্ধেয়া রেবা চট্টোপাধ্যায়, প্রীতিভাজন অলকেন্দু দাস, দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ মণ্ডল, অনীশ দাস, অধ্যাপিকা ড. বনানী বর্মণ, অধ্যাপিকা চৈতালি কাঞ্জিলাল, নিরঞ্জন ঘোষ প্রমুখ। অধ্যাপক ড.

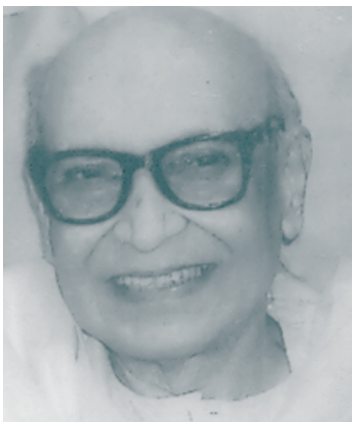

লোকনাথ চক্রবর্তী এই মাহেন্দ্রক্ষণে বরেণ্যপুরুষ সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথের পুস্তিকাকারে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ অধ্যাপক গোস্বামীকে উপহারস্বরূপ প্রদান করেন। শিল্পী অসিতি নন্দীকে এই সভামঞ্চে উৎসাহিত ও অভিনন্দিত করা হয়। গত ১৬ জুলাই গুরুপূর্ণিমার দিন অধ্যাপক গোস্বামী রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচারের এই প্রেমানন্দ হলে তাঁর গুরু মহামহোপাধ্যায় ড. যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, ডি. লিট্ মহোদয়ের অধ্যাপনার ১০৮ বছর পূর্তিতে এক মনোজ্ঞ সভায় গুরুপূর্ণিমা তিথি উদ্‌যাপনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন অধ্যাপক গোস্বামী এবং 'বিদ্যাবংশ' শীর্ষক এক অসামান্য বইয়ের উদ্বোধন করেন তিনি— এটি একটি অভিনব সংকলন। একই দিনে অধ্যাপক গোস্বামীর শিক্ষাগুরু 'মনীষী সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়'-শীর্ষক' বইটিও প্রকাশিত হয়। লেখক— মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক ড. সীতানাথ গোস্বামী বাচস্পতি। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন শ্রীজগন্নাথ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পুরীর প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নীলকণ্ঠ পতি, ডি.লিট্ মহোদয়, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড়-এর সহ-সম্পাদক স্বামী তত্ত্ববিদানন্দ মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, গোলপার্কের গবেষণা-বিভাগের অধ্যক্ষ স্বামী কৃষ্ণানন্দ মহারাজ। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ও মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা এবং ছাত্র-ছাত্রীরাও এই সভায় উপস্থিত থেকে এই সভাকে সফল্যমণ্ডিত করেন।

সারাজীবন ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে অধ্যাপক গোস্বামী প্রয়াসী হয়েছেন এবং এজন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকেই প্রধান অবলম্বন জেনে ১২ বছর বয়স থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। ১৯৪৮ সালে গান্ধী হত্যার মিথ্যা অজুহাতে সম্পর্কে নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে তিনি কারাবরণ করেন। সঙ্ঘের দুর্দিনে যাতে সঙ্ঘকার্য বিন্দুমাত্র বিঘ্নিত না হয় তার জন্য তিনি ইং ১৯৪৮ সালে বিএ পরীক্ষার অব্যবহিত পরে সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে আত্মনিয়োগ করেন এবং প্রায় দু' বছর প্রচারক হিসেবে থেকে সঙ্ঘকার্যকে এগিয়ে নিয়ে যান। বিএ ফাইনাল পরীক্ষার সামান্য প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অনার্সে দ্বিতীয় স্থান পান। অধ্যয়নে বিরতি ঘটিয়ে আবার তিনি এমএ ক্লাশে ভর্তি হন, তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো রেকর্ড ভেঙে সংস্কৃত এমএ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেন। এরপর ক্রমাগত কয়েকটি সম্মান লাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রানি রামরক্ষী পুরস্কার ও স্বর্ণপদক পান ১৯৫৬ সালে। ১৯৫৬ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকপদে যোগদান করেন। ১৯৬১-তে রিডার এবং ১৯৭৪ সালে প্রফেসর হন। যাদবপুর সংস্কৃত বিভাগের প্রধান হিসেবে প্রায় ১০ বছর কাজ করেন। তাঁর কাছে গবেষণা করে আজ পর্যন্ত ৪০ জন ডক্টরেট পেয়েছেন। এর মধ্যে কয়েকজন ছাত্র আবার ডি.লিট্ বা বিদ্যাবাচস্পতি উপাধি পেয়েছেন। এর মধ্যে বেশ কয়েকজন ছাত্র আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবেও বৃত হয়েছেন। বেদ, উপনিষদ ও বেদান্তের গ্রন্থ বচনায় তিনি অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেছেন। ড. গোস্বামী এখনও রামকৃষ্ণ মিশন, গোলপার্কের সঙ্গে যুক্ত।

১৯৪৮ সালে বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির গোড়াপত্তন করে শিয়ালদহ স্টেশনে শরণার্থীদের রুটি ও গুড় বিতরণ করেছেন অধ্যাপক গোস্বামী। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পশ্চিমবঙ্গ শাখার প্রথম সম্পাদক; পরে সারা ভারত কার্যকরী সমিতির সহ-সভাপতি হন। তাঁকে ৩ বছরের জন্য 'বিশ্ব-ভারতী'র কর্মসমিতির সদস্য মনোনীত করা হয়। ১৯৭৪ সালে ছত্রপতি শিবাজীর ত্রিশতাব্দী রাজ্যারোহণ সমিতির তিনি পশ্চিমবঙ্গ-সম্পাদক হন। স্বস্তিকা পত্রিকার ৫০ বছর পূর্তিতে তাঁকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়।

নদীয়া জেলার সম্ভ্রান্ত বংশে ইং ১৯২৯ সালের ১৩ জুলাই অধ্যাপক গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। প্রেমাবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সহধর্মিণী বিষ্ণুপ্রিয়ার ভ্রাতা যাদবচার্যের একাদশ বংশজ আচার্য মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক ড. সীতানাথ গোস্বামী।

লিঙ্গ বৈষম্যের আশু নিরসন প্রয়োজন : উপ-রাষ্ট্রপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ লিঙ্গ বৈষম্যের সমস্যা দূর করে মহিলাদের সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দিলেন উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। ইন্ডিয়া উইমেন প্রেস কোর-এর রজত জয়ন্তী বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে শ্রী নাইডু আরও বলেন, দেশ গঠনের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মহিলাদের সমান অংশীদার হিসেবে শামিল করার সমবেত দায়িত্ব সরকার, গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের ওপর ন্যস্ত রয়েছে। গণমাধ্যম ক্ষেত্রে লিঙ্গ এবং বেতনক্রমে অসমতার একাধিক ঘটনার কথা উল্লেখ করে উপ-রাষ্ট্রপতি প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া, ন্যাশনাল ব্রডকাস্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের মতো সংবাদ পরিবেশনকারী সংগঠনগুলির সমবেত প্রয়াস গ্রহণের ওপর গুরুত্ব দেন। সাংবাদিকতার পেশায় লিঙ্গের ভিত্তিতে যে বৈষম্য রয়েছে তার সমাধানসূত্র খুঁজে বের করতে এ ধরনের সংগঠনগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

বিভ্রান্তিকর বা অতিরঞ্জিত খবরের ভীতি সম্পর্কে শ্রী নাইডু বলেন, জনসাধারণের মধ্যে ভীতি ও বিভ্রান্তিকর খবর প্রচারের পরিবর্তে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে যাবতীয় অশান্তি এড়াতে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করতে হবে। একইসঙ্গে, সাধারণ মানুষকেও তাঁদের অধিকার ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করার বিষয়টিও গণমাধ্যমের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া, ন্যাশনাল ব্রডকাস্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিভ্রান্তিকর খবর, অর্থের বিনিময়ে খবর ও একপেশে খবর প্রচার/সম্প্রচারের ভীতি দূর করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন। সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকে সামাজিক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করে উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, গণমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁদের লেখা, দৃষ্টিভঙ্গি ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। উপ-রাষ্ট্রপতি আঞ্চলিক গণমাধ্যমকে ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রসারে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি জোর দিয়ে বলেন,, গণমাধ্যমকে কৃষক, মহিলা, যুবসম্প্রদায়, শিল্পোদ্যোগী ও গ্রামীণ ভারতের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ গুরত্ব দিতে হবে।

আর এস এস দেশের ১৩০ কোটি দেশবাসীকেই হিন্দু হিসেবে বিবেচনা করে : মোহন ভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত সম্প্রতি বলেছেন যে, ভারত পরম্পরাগত ভাবে হিন্দুত্ববাদী দেশ। তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে তিন দিনের এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী ভাগবত বলেন যে, ধর্ম ও আচার আচরণে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সঙ্ঘ দেশের ১৩০ কোটি দেশবাসীকেই হিন্দু হিসেবে বিবেচনা করে। তিনি বলেন, 'আর এস এস যখন কাউকে হিন্দু বলে অভিহিত করে, এর অর্থ এমন লোকেরা, যারা ভারতকে তাদের মাতৃভূমি হিসেবে বিবেচনা করে এবং এই দেশকে ভালোবাসে, তারা ভারতমাতার সন্তান। তিনি যে ভাষাই বলুন, যে ধর্মেরই অনুসারী

হোন বা যে কোনও উপাসনা করুন না কেন, তিনি হিন্দু।' সঙ্ঘের দৃষ্টিতে, ভারতের ১৩০ কোটি বাসিন্দাই হিন্দু সমাজ। আর এস এস সবাইকে আপন হিসেবে বিবেচনা করে সবার উন্নয়ন চায়। সঙ্ঘ সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলতে চায়। সরসঙ্ঘচালক বলেন, 'ভারতের ঐতিহ্যবাহী ধারণা হলো এক সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া। লোকেরা বলে যে আমরা হিন্দুত্ববাদী। আসলে আমাদের দেশ ঐতিহ্যবাহী হিন্দুত্বের অনুসারী। তিনি বলেন, একটি বিখ্যাত উক্তি আছে যে বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্য বর্তমান। তবে আমাদের দেশ এর থেকে এক ধাপ এগিয়ে। এখানে আমরা কেবল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই দেখি না, ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য দেখি। আমরা বৈচিত্র্যে ঐক্য খুঁজছি না। আমরা ঐক্য সন্ধান করছি যা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে এবং এই ঐক্য অর্জনের অনেকগুলি উপায় রয়েছে। শ্রীভাগবত বলেন যে, সঙ্ঘ দেশের পক্ষে কাজ করে এবং সর্বদা দেশের বিজয় কামনা করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, শুধু রাজনীতি দেশে পরিবর্তন আনতে পারে না, কেবল মানুষ তা আনতে পারে।

ভারত স্টেজ ৬ মেনে চলার আহ্বান কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রকের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ যানবাহনের ধোঁয়া নির্গমন সংক্রান্ত নিময়নীতি ভারত স্টেজ ৬ আগামী ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর করার প্রস্তাব রয়েছে। সংশ্লিষ্ট নিয়মনীতি মেনে চলার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক সকলের কাছ থেকে মতামত আহ্বান করেছে। বর্তমানে সারা দেশে যানবাহনের ধোঁয়া নির্গমন সংক্রান্ত ভারত স্টেজ ৪ ব্যবস্থা ২০১৮-র পয়লা জুন থেকে বলবৎ রয়েছে। প্রস্তাবিত ভারত স্টেজ ৬ ব্যবস্থা ইউরেপে যে ধরণের নিয়মনীতি মেনে চলা হয়, তার সমতুল্য। বর্তমানে ইউরোপে স্টেজ ও ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ভারতের স্টেজ ৬ কার্যকর হলে ইউরোপের স্টেজ ৫-এর সমতুল্য হয়ে উঠবে। ইউরোপে এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ভারতের স্টেজ ৬ কার্যকর হতে চলেছে। মন্ত্রকের পক্ষ থেকে গত ১৩ ডিসেম্বর সরকারি গ্যাজেটে প্রকাশিত খসড়া বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ভারতে স্টেজ ৬ কার্যকর করার ব্যাপারে জনগণের কাছ থেকে যে মতামত ও পরামর্শ আহ্বান করা হয়েছে তা পরিবহণ বিষয়ক যুগ্ম সচিবের কাছে ই-মেল মারফত পাঠানো যাবে।

সংশ্লিষ্ট নিয়মনীতি চূড়ান্ত হওয়ার ৩০ দিন আগেই মতামত পাঠানোরও অনুরোধ জানানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের মহিলা কৃষকদের সহায়তা প্রদান কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক কৃষিক্ষেত্রে মহিলাদের সশক্তিকরণের লক্ষ্যে 'মহিলা কিষাণ সশক্তিকরণ পরিযোজনা' (এমকেএসপি) চালু করেছে। কৃষিকাজের মধ্যে দিয়ে যাতে মহিলারা তাঁদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটাতে পারে সেই লক্ষ্যেই এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এমকেএসপি এই যোজনার আওতায় দেশের ২৪টি রাজ্যের ৮৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৬ লক্ষের বেশি মহিলা সুবিধা পেয়েছেন। এর মধ্যে মহারাষ্ট্রের ১ লক্ষ ৮১ হাজার মহিলা এই সুবিধা পেয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই যোজনার জন্য ৮৭৪.৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। যার মধ্যে মহারাষ্ট্রের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৫২.১৫ কোটি টাকা। মহিলা কৃষকদের সহায়তা প্রদানের অঙ্গ হিসেবে কৃষি সহায়তা এবং কৃষি কল্যাণ দপ্তর 'এগ্রি ক্লিনিক অ্যান্ড এগ্রি বিজনেস সেন্টার', 'জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশন'-এর মতো একাধিক প্রকল্প চালু করেছে। লোকসভায় এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিংহ তোমর।

জেনেরিক ওষুধে উৎসাহদান কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের

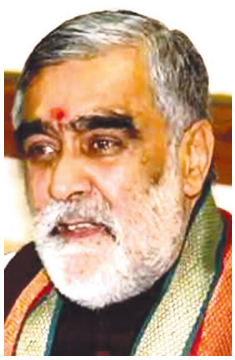

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জেনেরিক ওষুধের গুণমান বজায় রাখতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রক। ওষুধ উৎপাদন এবং বিক্রয়কারী সংস্থাগুলিকে ওষুধের প্যাকেটের গায়ে জেনেরিক নাম সঠিকভাবে লিখতে বলা হয়েছে। এই বিষয়গুলি ওষুধ প্রস্তুত ও বিক্রয়কারী সংস্থাগুলির লাইসেন্স প্রদানের সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে খতিয়ে দেখতে হবে। এমনকী চিকিৎসকদের ওষুধের নাম লেখার সময় বড়ো হাতের অক্ষরে জেনেরিক নাম লিখতে বলা হয়েছে। এরজন্য মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া ২০১৭ সালে ২১ এপ্রিল একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। কোনও চিকিৎসক এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজ্যসভায় এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী অশ্বিনী কুমার চৌবে।

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির ওপর সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ কেন্দ্র সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্যে কেন্দ্র সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে সংবাদমাধ্যমে সার্বিক প্রচার, বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ও পক্ষ উদযাপন এবং বিভিন্ন

সচেতনতামূলক কর্মসূচি। সরকার এই লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ সালে ৩১ কোটি ৫৪ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা ব্যয় করেছে। পরবর্তী দু'বছর এই ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে যথাক্রমে ৩৩ কোটি ৬ লক্ষ ২১ হাজার টাকা এবং ৩১ কোটি ২৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত খরচের পরিমাণ ৫ কোটি ৪৮ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে পশ্চিমবঙ্গ, আন্দামান- নিকোবর, ত্রিপুরা ও অসমে বরাদ্দের পরিমাণ যথাক্রমে ২০২ কোটি ১৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা, ২ কোটি ৭১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, ১৬ কোটি ৫০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা এবং ১৬৬ কোটি ৮৭ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। এই সময়কালে পশ্চিমবঙ্গ, আন্দমান-নিকোবর, ত্রিপুরা ও অসমে ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৭৫ কোটি ২৬ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, ২ কোটি ৯৬ লক্ষ ৩০ হাজার এবং ৬৭ কোটি ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

জনস্বাস্থ্য রাজ্য সরকারগুলির আওতাভুক্ত হলেও জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন রাজ্যগুলিকে এক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকে। ১৯ থেকে ২৪ বছর বয়সি অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলাদের জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আটটি কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী অশ্বিনী কুমার চৌবে এই তথ্য জানিয়েছেন।

আয়ুষ্মান ভারত—প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার অপব্যবহার রুখতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আয়ুষ্মান ভারত-প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার (এবি-পিএমজেএওয়াই) আওতায় ১, ৯৯৩টি হেল্‌থ বেনিফিট প্যাকেজ রয়েছে। প্রতিটি প্যাকেজের হার সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। সরকারি ও নথিভুক্ত বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে সাধারণ মানুষের চিকিৎসার জন্য এই প্যাকেজগুলির খরচ অভিন্ন। নির্দিষ্ট প্যাকেজের নির্ধারিত হার অনুযায়ী হাসপাতালগুলিতে তাদের প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়া হয়। এই যোজনার অপব্যবহার রুখতে একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে— যোজনার আওতায় রোগী ভর্তির ক্ষেত্রে রাজ্য হেল্‌থ এজেন্সিগুলি থেকে আগাম অনুমোদন নেওয়া প্রয়োজন। যোজনা শুরুর সময় থেকে জালিয়াতি রোধে সুসংবদ্ধ নীতি-নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। রাজ্যগুলিকে নিয়মিতভাবে জালিয়াতি রোধ, জালিয়াতি চিহ্নিতকরণ ও জালিয়াতির হদিশ পেতে প্রয়োজনীয় পরমার্শ দেওয়া হয়। জালিয়াতি রুখতে সরকারি হাসপাতালগুলিতে সমস্ত প্যাকেজের সুযোগ-সুবিধা রোগীদের কাছে পৌঁছে দিতে আগাম নথিপত্র চেয়ে পাঠানো হয়। সমগ্র যোজনার ওপর নজরদারি চালাতে জাতীয় স্তরে জালিয়াতি দমন ইউনিট গঠন করা হয়েছে। রাজ্যস্তরে গঠিত এ ধরনের ইউনিটগুলি জাতীয় ইউনিটকে সাহায্য করে থাকে। এছাড়াও, এবি- পিএমজেএওয়াহ -এর অপব্যবহার রুখতে রিয়েল টাইম ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে তথ্যের নিয়মিত বিশ্লেষণ ও নজরদারি চালানো হয়।

সম্ভাব্য অভিযোগগুলির ক্ষেত্রে জালিয়াতি দমনে একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং প্রয়োজনে তদন্তের জন্য রাজ্য এজেন্সিগুলির সঙ্গে তথ্য আদানপ্রদান করা হয়। হাসপাতালগুলির রাজ্য জালিয়াতি দমন ইউনিটগুলির সঙ্গে নিয়মিত ভিত্তিতে যৌথভাবে মেডিকেল অডিট করা হয়। অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য মোবাইল ফিল্ড ইনভেস্টিগেশন অ্যাপ চালু করা হয়েছে। রাজ্যস্তরের কর্মীদের দক্ষতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয় যাতে তাঁরা জালিয়াতি দমনের বিষয়গুলি যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারেন। লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী অশ্বিনী কুমার চৌবে এই তথ্য জানিয়েছেন।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

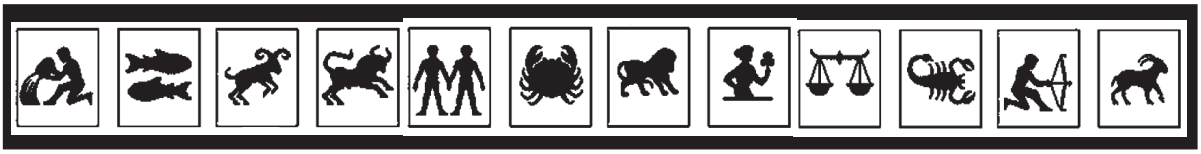

৬ জানুয়ারি, ২০২০ (সোমবার) থেকে ১২ জানুয়ারি (রবিবার) ২০২০। সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে রাহু, বৃশ্চিকে মঙ্গল, ধনুতে রবি, বুধ, বৃহস্পতি, শনি, কেতু, মকরে শুক্র। পুনরায় ৯-০১-বৃহস্পতিবার, ভোর ৫টা ৩৭ মিনিটে শুক্রের কুম্ভে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র মেষে ভরণী নক্ষত্র থেকে কর্কটে পুষ্যা নক্ষত্রে।

মেষ : পেশাদারদের কর্মস্থানে সৃষ্ট সমস্যা। উদারতা, বুদ্ধিমত্তা। মুখ মিষ্টতা প্রতিহার করুন। স্তোক বাক্যে দিশেহারা, কর্তব্যে ত্রুটি, স্ত্রী ও ভ্রাতৃবিরোধ, মামলা-মোকদ্দমায় আর্থিক ক্ষতি। গৃহসজ্জা, প্রশাধন, ডিজাইনার, মাদক দ্রব্য তরল ব্যবসায় নতুন উদ্যোগ, আমদানি, রপ্তানি ও প্রাপ্তি শুভ। সপ্তাহের শেষভাগে নিরন্তর প্রচেষ্টা ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তির সাহায্যে গ্রীষ্মের তাপদাহের অবসানে নব বসন্তের পরশ।

বৃষ : অধিক আত্মবিশ্বাসী, অহংবোধে ভালো সুযোগ হাতছাড়া ও একাধিক কর্মপরিবর্তন যোগ। নিজ বিচারধারায় আপোশহীন পথচলা ভাগ্যের প্রতিকূল। প্রবাসী-ব্যবসায় উন্নতি, বস্ত্র, অলংকার ও বিধিবহির্ভূত আয়ের ক্ষেত্র প্রশস্ত। সন্তানের চালচলনে বেপরোয়া, দিশাহীন উচ্ছৃঙ্খলতায় ভারাক্রান্ত হৃদয়। সুন্দরী ও সৌন্দর্য সুধায় সময়ের অপচয়।

মিথুন : শারীরিক অলসতা, বুদ্ধির আড়ষ্টতা, সাহিসকতার অভাবে স্বজনের সঙ্গে সদ্ভাব, ধর্ম-সম্মান বিনষ্ট। স্ত্রী-সম্পর্কে বন্ধু হতে সতর্ক থাকুন। ভ্রাতা-ভগ্নী ও প্রতিবেশীর সঙ্গে সু-সম্পর্কের অভাব। ব্যবসায় বিনিয়োগে জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আলোচনান্তে পদক্ষেপ নিন। কর্মপ্রার্থীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা ফলবতী হবে।

কর্কট : নতুন বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশের সদ্ব্যবহার ও আমদানি-রপ্তানি ব্যবস্থায় চাঙ্গা অর্থনীতি। কর্মোপলক্ষ্যে সফল বিদেশ যাত্রা। কর্মপ্রার্থীর নতুন কর্মে যোগদান। পেশাদারদের অর্থনৈতিক সুযোগ লাভ। প্রবাসী আত্মীয়ের প্রত্যাগমনে সৌভাগ্যের সোপানে উন্নীত। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, বেসরকারি লগ্নি থেকে ডিভিডেন্ট প্রাপ্ত শুভ। দূরবর্তী স্থানে ভ্রমণ ও সমালোচনায় সতর্ক থাকুন।

সিংহ : সময়মতো খাদ্য গ্রহণও শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া জরুরি। গ্রহের পদোন্নতি। সংগীত, সাহিত্য, অভিনয়, ভাস্কর্য ও পেশাগত ব্যক্তিদের আনুষ্ঠানিক ব্যস্ততা, প্রসার, বিত্ত ও আভিজাত্য বৃদ্ধি। সপ্তাহের প্রান্তভাগে ঈর্ষাকাতর প্রতিবেশীর কারণে অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন, সমাজ কল্যাণে সুধীজনের সান্নিধ্যে ভালো মিত্র লাভ।

কন্যা : অধীনস্থ ও শ্রমিক কর্মচারীর সহায়তায় ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি। কর্মে বাধা বা জটিলতার অবসানে দুঃসাহসিক সাফল্য, চারুকলায় নৈপুণ্য, সৃষ্টিশীল কর্মে স্বীকৃতি, প্রেম-প্রণয়ে রাহু মুক্তি, বিতর্কিত সম্পত্তির সুষ্ঠু সমাধান। স্বামী-স্ত্রীর যৌথ সহযোগিতায় স্বজন বিরূপতার অবসান। শরীরের নিম্নাঙ্গের চোট-আঘাত ও সংক্রমন জনিত অসুস্থতায় ক্লেশ।

তুলা : মৌলিক চিন্তা, তেজস্বী, বিক্রয় কুশল, আত্মীয় কুটুম্ব ও সম্পত্তি লাভ, হাস্যময়, রমণী প্রিয়, বাক্‌চাতুর্যে নিপুণ, পরিকল্পনায় সফল। গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও প্রশাসনিক দায়িত্ব বৃদ্ধি। জ্ঞাতি শত্রুর চক্রান্তে বৈষয়িক গোলযোগ ও মানসিক অস্থিরতা। জীবনসঙ্গীর জেদের কারণে নতুন কর্ম পরিকল্পনার বাস্তবায়নে বিঘ্ন। বিদ্যার্থীর জ্ঞানার্জনে আরও অধ্যাবসায় ও মনঃসংযোগ প্রয়োজন।

বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততা, উচ্চশিক্ষায় মনোনিবেশ, বন্ধুর দ্বারা উপকৃত পিতার শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ। সন্তানের লেখাপড়ায় সাফল্য, ভবিষ্যৎ বিষয়ে দুশ্চিন্তার অবসান। ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসায় প্রতিযোগিতার মধ্যে সাফল্য। আর্থিক স্থিতি ভালো হওয়ায় সঞ্চয় যোগ। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বিড়াল তপস্বী মিত্র দ্বারা মূল্যবান দ্রব্যাদি নষ্ট।

ধনু : দৈহিক দুর্বলতা, আয়ের শ্লথ গতি, প্রতিবেশীর বিরূপতা, ক্রোধ ও মানসিক ক্ষোভে গৃহ পরিত্যাগের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতায় কর্তৃপক্ষের শংসা, পদোন্নতি অথবা কর্মপরিবর্তনের সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীর অটুট মনঃসংযোগ ও চাপমুক্তি। ভ্রমণ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ পরিহার শ্রেয়।

মকর : অপ্রিয় সত্যকথন, প্রখর দায়িত্ব ও কর্তব্য পরায়ণতায় অধস্তন কর্মচারীর মনঃক্ষুণ্ণতা, অসহযোগিতায় মানসিক চাপ, ব্যবস্তা, জটিলতা। কৌশল ও সমঝোতা তাৎক্ষণিক সাফল্যের মাপকাঠি। সন্তানের কারণে পারিবারিক অশান্তি। খেলাধুলা, ব্যায়ামবিদ, ফ্যাশন ডিজাইনারের অর্থ, বিত্ত ও সম্মান। হঠাৎ প্রাপ্তি অথবা বিধি বহির্ভূত পথে উপার্জনের হাতছানি।

কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে জটিল সমস্যার সমাধানে শংসা ও প্রভাব বৃদ্ধি। সন্তানের বুদ্ধিমত্তা, সঠিক চিন্তায় প্রগতির প্রশস্ত পথ। জীবনসঙ্গীর নামে ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি। শিল্পী, কলাকুশলীদের সৃষ্টি সুখের উল্লাসে নব অধ্যায়ের সূচনা। মোবাইল, ফেসবুক আসক্তি জনিত পড়াশুনায় আশানুরূপ ফল লাভে বাধা। জননেন্দ্রিয়ের পীড়া, উচ্চস্থান থেকে পতনজনিত ক্লেশ।

মীন : সাহসি, কর্তব্যপরায়ণ, স্বাধীনচেতা, অনুভবী, সৌন্দর্যের উপাশক, মানবহিতৈষী, সর্বকর্মে নিষ্ঠা, বিজয়ীর সম্মান। গবেষকদের সাফল্য ও স্বীকৃতি লাভ। বিশিষ্টজনের পরামর্শ ও গুরুজনের উপদেশ ও চলার পাথেয় স্বরূপ। নিকটজনের শুভ খবরে আনন্দ ও গর্বের বিষয়। ব্যার্ধক্যে শান্ত ও সংযত থাকুন।

● *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

—শ্রী আচার্য্য